অরণ্যের পাশ দিয়ে শীর্ণ কালানদী পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। একদিন তাঁদের নৈশভ্রমণ হয়েছিল এই নদীতে, নৌকায়। মোহানার কাছে বালুতট দিয়ে হেঁটে ফেরার কালে নিশীথ রাত্রে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মায়াময় সৌন্দর্য তাঁদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। অসীম গভীরতায় মগ্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে কবিতাটি যে ভাল এমন দাবি তিনি করেননি, স্মরণের মধ্য দিয়ে অনেক পরিমার্জিত হয়েছে। এখানে রচনার বিষয়টিই প্রধান। তবুও মনে হয় এই অভিজ্ঞতাঅর্জনের উল্লাসে তিনি যা রচনা করলেন, সেই অল্পবয়সের স্মৃতির মালা গাঁথতে বসে তাকে তিনি বর্জন করেননি, মমতাভরে স্থান দিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি'র পাতায়।

### প্রকৃতির প্রতিশোধ

কারোয়ারে বসেই এই নাট্যকাব্যটি লেখা। 'জীবনস্মৃতি'র প্রেক্ষণে মনে করা অসংগত নয় যে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনাটিকে সাহিত্যসৃষ্টির ধারায় রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ স্থায়ী মূল্য দিয়েছেন। মানবজীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকেই বৃহতে উত্তরণ হয়, বহু রচনায় তার পরিচয় আছে। সন্ন্যাসী সংসার মায়াবন্ধনকে ছিন্ন করে অনন্তর ধ্যান করেছে, কিন্তু বোঝেনি অনন্ত অসীম আছে সীমারই মধে; বহু রচনায় তার পরিচয় রয়েছে। সন্ন্যাসী সংসারের মায়াবন্ধনকে অনন্তর ধ্যান করে গেছে, কিন্তু বোঝেনি, অনন্ত অসীম আছে সীমারই মধ্যে। বালিকার স্নেহপাশ উপেক্ষা করতে না পেরে অনন্তের ধ্যান থেকে প্রত্যাবর্তন করে সংসারসীমায়। কারণ "সীমার মধ্যেও সীমা নেই"। কারোয়ার সমুদ্রের দূরবিস্তৃত রূপ ভুলিয়ে দেয় প্রত্যক্ষ বাস্তব সংসারের রূপকে। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার অচেতনতা, আরেকদিকে মনগড়া অসীমের ধ্যান—প্রেমের আশ্রয়েই এই দুইএর মধ্যে সংযোগ সেতু তৈরী হয়। আরেকদিকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্ধকার পথের অনিশ্চয় পদক্ষেপ থেকে বেরিয়ে এসে তবেই প্রকৃতির আনন্দময় স্পর্শ পেয়েছিলেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সেই অনুভূতিই অন্য রঙে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি—"পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।" এই তত্ত্বব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনায় ছড়িয়ে আছে। এই অংশের আরেকটি ঘটনা—কারোয়ার থেকে ফিরে ১৮৯০ সালে ২৪ শে অগ্রহায়ণ, বাইস বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হল।

### ছবি ও গান

'প্রভাতসংগীতে'র পালা শেষ হয়ে আরম্ভ হল 'ছবি ও গান'। তখন বাস করছিলেন চৌরঙ্গীর নিকটবর্তী সার্কুলার রোডের একটি বাগানবাড়ীতে। লোকালয়ের দৃশ্য রবীন্দ্রনাথকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। তিনি নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটি ছবি আঁকতে চাইছিলেন। পটতুলিতে না হলেও কাব্যে ও ছন্দে সেই চিত্র তাঁর হাতে বর্নময় হল। এই নতুন পালায় তিনি বলছেন, অনেক বেহিসেবী শব্দবর্ণ রয়েছে। কিন্তু সামান্যকে হৃদয়ের রসে জারিত করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি। 'জীবনস্মৃতি' লেখার কালে তাঁর পরিণত উপলব্ধিতে তিনি দেখিয়েছেন বাইরের অতি তুচ্ছতার মধ্যেও বিশ্ববোধের অনুভূতি থেকে থেকে হৃদয়ের তন্ত্রীতে বেজে ওঠে; তার জন্য সচল জীবনপ্রবাহকে ত্যাগ করে দূরে যেতে হয় না। সত্যবোধ সেখান থেকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়।

### বালক

সেজবউঠাকুরাণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছোটদের জন্য বালক নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এবং বাড়ীর বয়ঃকনিষ্ঠরা মুখ্যতঃ সেখানে লিখবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা যথেষ্ট না হওয়ায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন লেখা দেওয়ার জন্য। একটি স্বপ্নলব্ধ গল্প রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিল, যার থেকে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের সৃষ্টি। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত ছিল গল্পের পটভূমি, অন্তরধর্মে ছিল

প্রেম ও হিংসার দ্বন্দ্ব। স্বপ্নে আভির্ভূত বালিকার রক্ত দেখে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, রূপ নিল নিদারুণ সংঘর্ষের বলিদান হিসাবে জয়সিংহের আত্মদানে। প্রতিমাসেই 'বালকে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও পত্রিকাটি এক বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়।

এর পর রবীন্দ্রনাথ লঘু চালে তাঁর নির্ভার জীবনের কিছু ঘটনা বলেছেন। সংসারের রূঢ়তার সঙ্গে তখনও তাঁর তেমন পরিচয় হয়নি। পথে মানুষের আনাগোনা, বর্ষা, শরৎ, বসন্তের আগমন সবই তিনি উপভোগ করতেন। কিছু আবেগতাড়িত অনুভূতি তাঁকে চঞ্চল করত। "দু'একজন লক্ষ্মীছাড়া বিনা পরিশ্রমে আমার দ্বারা অভাবপূরণ করিয়া লইবার জন্য নানা ছল করিয়া আমার কাছে আসিত।" রবীন্দ্রনাথ বলছেন, এই ছলনার প্রয়োজন ছিল না, তিনি অকৃপণ হাতেই বিনা বিচারে সাহায্যদানে প্রস্তুত ছিলেন সেই সময়ে। কিন্তু সাহায্যের জন্য অত্যাচারের মাত্রা এমনই বাড়ল, যাতে ছেদচিহ্ন টানতে তিনি বাধ্য হলেন।

তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কথাও এখানে জানিয়েছেন। প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে তিনিও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান ও সাহিত্যালোচনার সঙ্গী। রবীন্দ্রজীবনের এই পর্যায়টি উপভোগের আনন্দ নিয়ে গঠিত। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের সূচনা।

### বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সে বঙ্কিমচন্দ্র এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা। চন্দ্রনাথ বসু ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা এবং এই সম্মিলনীতে কবিতাপাঠের দায়িত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ অতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছিলেন—সকলের মধ্যে থেকেও যিনি স্বতন্ত্র। এতদিন তাঁর লেখার মাদকতায় তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে দেখার পর তিনি শুধু অভিভূতই হননি, বিস্মিতও হয়েছিলেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, "তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল"। পরে তাঁকে দেখার ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ আসেনি।

জীবনের স্তরে স্তরে নিজের আচার আচরণ মানসিকতা ব্যক্ত করেছেন। তিনি লেখকদলে সর্বকনিষ্ঠ বলে চিহ্নিত হয়েছেন। ইংরাজ কবিদের নামজুড়ে নামকরণের প্রবণতায় তিনি 'বাংলার শেলি' হয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই তুলনাকে একেবারেই সমর্থন করেননি। বিদ্যা, অভিজ্ঞতা, ভাবুকতা, সাজপোষাক—কিছুই তখন পরিণত ছিল না—"অত্যন্ত খাপছাড়া হইয়াছিলাম"।

অক্ষয় সরকারের 'নবজীবন' পত্রিকায় দু' একটা লেখা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' অপেক্ষা ধর্মালোচনায় বেশি আগ্রহী হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও একটি গান ও বৈষ্ণব পদ অবলম্বনে ভাবোদ্বেল গদ্যরচনা করেছেন। প্রায় এই সময় থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয়, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে থাকতেন। খুব অল্পকথায় রবীন্দ্রনাথ কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। প্রথম শশধর তর্কচূড়ামণির কথা, বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁকে সাধারণের সঙ্গে পরিচিত করান। তখন হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মর্যাদাবৃদ্ধির চেষ্টা করছে এবং তার প্রচারও হচ্ছে। তবে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন 'দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়োসফি এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল"। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে যোগ দিতে পারেননি, 'প্রচার' পত্রে তাঁর ধর্ম ব্যাখ্যায় শশধর তর্কচূড়ামণির প্রভাবও ছিল না। রবীন্দ্রনাথও পিছিয়ে ছিলেন না। ধর্মান্দোলনের তর্কবিতর্ক কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে, কতক বা কৌতুক নাট্যে, কতক বা তখনকার সঞ্জীবনী কাগজে পত্র আকারে বাহির হইয়াছিল'। রবীন্দ্রনাথ 'মল্লভূমি'তে উপস্থিত ছিলেন। সেই উত্তেজনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর মতবিরোধ হয়েছিল। 'ভারতী' ও 'প্রচারে' তার বিবরণ রয়েছে। কিন্তু বিরোধের শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি তাঁর ক্ষমাসুন্দর স্বভাবের গুণে বিরোধের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছিল।

অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে রবীন্দ্রনাথ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

### জাহাজের খোল

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনায় দেশলাই কাঠি প্রস্তুত করার কারখানা, কাপড়ের কল প্রভৃতি চালানোর জন্য প্রচুর উৎসাহী হয়েছিলেন, কিন্তু দেশলাইও জ্বলেনি এবং কলে একটিমাত্র গামছা প্রস্তুত হয়েছিল। এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যোতিদাদার খেয়ালী ভাবনাগুলি পাঠকদের জানিয়েছেন। কিন্তু হাসির অন্তরালে তাঁর একটি গভীর বেদনাবোধ ছিল। কারণ এইসব বেহিসাবি মানুষরা কর্মক্ষেত্রকে উৎসাহের আধিক্যে ফলফুলশোভিত করার চেষ্টা করলেও, শেষ পর্যন্ত তা নিষ্ফল হয়। কিন্তু সেটা আপাতদৃষ্টিতে। তাঁরা সৃষ্টিকর্মে যে প্রেরণার ঢেউ তোলেন, তাতে অনেক কিছু ভেসে গেলেও ক্ষেত্রের উর্বরতা হারায় না। সেইখানে যখন নতুন সৃজনের ফুলটি ফুটে ওঠে, তখন সেই উৎসাী প্রাণপুরুষরা বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যান, তাঁরা চিরদিনই 'ক্ষতিবহনে ভারাক্রান্ত', কিন্তু তার জন্য গতি থামে না।

'জাহাজের খোল' এমন একটি ঘটনাকে বর্ণনা করছে, যেখানে একটা অভিনবত্ব সকলকেই উৎসাহিত করেছে। সাতহাজার টাকা খরচ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এমন একটি খোল কিনেছেন, যাতে ইঞ্জিন বসিয়ে কামরা লাগিয়ে দিলেই জাহাজ হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা পাবে। তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছিলেন বিলাত কম্পানি, একটির পর একটি জাহাজ তৈরী হল, যাত্রীবৃদ্ধির জন্য ভাড়া অত্যন্ত কমানো হল, এমন কি বিনা পয়সায় খাওয়ানোও হত। শুধুমাত্র যাত্রীতে জাহাজ ভর্তি হল না, হল ''ঋণে এবং সর্বনাশে। তাঁর 'স্বদেশী' নামে জাহাজ ডুবে গেল, তখন তিনি কপর্দকশূণ্য। দেশের লোক তাঁকে না বুঝলেও, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর অন্তরসত্তাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিরাসক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিন থেকে লাভবান হলেন— ''সে তাঁহার এই সর্বস্ব ক্ষতিস্বীকার''।

### মৃত্যুশোক

মাতৃহারা হওয়ার বেদনা তীব্রতা নিয়ে আসেনি শিশু রবীন্দ্রনাথের জীবনে। একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে, এই উপলব্ধিটুকু হয়েছিল। প্রাণহীন মায়ের চেহারা যন্ত্রণাক্লিষ্ট ছিল না। এক পরম শান্তির রূপ প্রত্যক্ষ করল বালকপুত্র। জীবন ও মৃত্যুর দুস্তর ব্যবধান বুঝবার মত বয়সে তখনও তাঁর হয়নি শুধু শ্মশানযাত্রার সময়ে মায়ের চিরবিদায় একটা শূন্যতার অনুভূতি ছড়িয়ে ছিল সমস্ত মনে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ তখন উপাসনায় স্তব্ধ।

বাড়ীর তখনকার কনিষ্ঠা বধূ মাতৃহীন বালকদের পরম স্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। এ বিচ্ছেদ চিরদিনের, কিন্তু শিশুমনের অপরিসীম প্রাণশক্তি সেই মৃতার কালিমায় বাঁধা পড়ে না, ক্রমশঃ সে স্মৃতি ম্লান হয়ে যায়। শুধু শুভ্র বেলফুলের কোমলতায় শিশুকবি যেন মায়ের সুন্দর হাতের স্পর্শ পেতেন।

কিন্তু চব্বিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করলেন, সেই বিচ্ছেদের অনুভূতি তাঁর সারাজীবনের সৃষ্টিকর্মে বিধৃত হয়ে আছে। কার মৃত্যু, সে সম্বন্ধে এখানে রবীন্দ্রনাথ নীরব। 'কান্নাহাসির দোল দোলানো পৌষফাগুনের মেলায় যে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন এই মৃত্যু তার শীতল স্পর্শ দিয়ে একটা বিরাট গহ্বর তৈরী করল তাঁর মনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অতলস্পর্শ অন্ধকারে এক অজানা পথে তিনি ঘুরতে লাগলেন, সবই আগের মতই আছে শুধু হারিয়ে গেছে তাঁর মনের সবথেকে কাছের মানুষটি। কিন্তু চিরদিনই আলোর সন্ধানে কবির অন্বেষণ, তাই না থাকার গভীর বিষাদকে অতিক্রম করে আলোর দীপ্তিতে সেই হারানো মানুষটি যেন নতুনভাবে উদ্ভাসিত হবার চেষ্টা করল। চলমান জীবন জন্মমৃত্যু বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে, সে ভাবে কেউ আবদ্ধ নয়—সত্যের এই নিশ্চিত রূপ রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন তখন। জীবনের ছন্দে তাঁর চিরদিনের আকর্ষণ সেইসঙ্গে সত্য উপলব্ধির এক প্রশান্ত বৈরাগ্য তাঁকে ঘিরে ছিল। বেশভূষায় নির্লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু জগৎকে নতুন করে চিনলেন

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এতদিন কাছে থেকে জীবনের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ আহরণ করেছেন; এবার তাঁর অনুভূতিতে জাগল সেই কথা যে, সৌন্দর্যকে কাছ থেকে নয়, দূর থেকে অন্তর দিয়ে স্পর্শ করতে হয়; আর মৃত্যু সেই সুন্দরকে দেখার জন্য দূরত্বের সৃষ্টি করে। "আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তারা বড়ো মনোহর।"

শুধু রাত্রির অন্ধকারে তাঁর চোখ যেন কাকে খুঁজে ফিরত অসীম আকর্ষণ নিয়ে, সেই অন্ধকারের আবরণকে উন্মোচন করে সকালের প্রথম সূর্যোদয়ের আগে জীবনের বিস্তৃত পরিধির স্বচ্ছ সুন্দরকে চিনিতে দিত।

### বর্ষা ও শরৎ

জীবনের দুটি পর্যায়কে এই অংশে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। এখানেও সেই সত্যবোধের অনুসন্ধিৎসা, যা জীবনের বহুবিধ প্রেরণা ও উপলব্ধি থেকে তৈরী হয়েছে।

তাঁর শিশুমন বর্ষার জলোচ্ছ্বাসের উদ্বেলিত হয়ে উঠত। বর্ষাস্নাত বাস্তবজীবনের ছবি সেই শিশুর স্মৃতি পটে আঁকা ছিল। জলের তোড়ে বারান্দা ভেসে যাচ্ছে, সেখানে ছুটে বেড়ানোয় প্রবল আনন্দ পুঞ্জপুঞ্জ মেঘের মধ্য থেকে বৃষ্টির জলধারা, চারিদিক অন্ধকার, মেঘের গর্জন, পন্ডিতমশাই ছুটি দিয়েছেন—এই মাতামাতির নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। আর তারই মধ্যে এই শিশুটির মন চলে গেছে লোকালয় ছাড়িয়ে তেপান্তরের মাঠে। শ্রাবণের ধারায় রিম্‌ঝিম্ শব্দ, বৃষ্টি না আসার প্রার্থনা, জলে ভাসমান গলি—বর্ষা ঋতু যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায়।

পঞ্চাশ বছরের রবীন্দ্রনাথ এক শিশুর চোখ দিয়ে বর্ষাঋতুকে দেখেছেন, কিন্তু শরতের কথায় তাঁর পরিণত মনের দেখাটাই বেশি সক্রিয় হয়েছে। তিনি বলছেন সোনাগলানো রোদে ঝলমল শরৎঋতুর একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। গানের আবেশে তাঁর মন মেতে থাকত। যৌবনের দিনগুলিতে শরৎঋতুর মাদকতা কবির মনকে নিয়ে যেত আলোর জগতে; সেই ঋতুর আকাশ বাতাস তাঁর সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। দুটি বয়সে দুই ঋতুকে দেখার মধ্যে যে দৃষ্টির কত বিবর্তন ঘটে, সে কথা তিনি জানিয়েছেন তাঁর স্মৃতির পাতা খুলে। বর্ষা এসেছিল তাঁর কাছে বহির্বিশ্বের সাজসজ্জা নিয়ে আর শরৎ যেন মানুষের সুখদুঃখের লীলাসঙ্গী।

তাঁর কবিতা এখন মানবজীবনকে মুখ্যতঃ আশ্রয় করেছে। কিন্তু সে জীবন বড়ো জটিল, চলার পথে পথে বাধা আর নানা আবর্তন-বিবর্তন—"মনের সঙ্গে মনের আপোস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া।" জীবনের সেই বহুমুখী বিচিত্রতার মধ্য দিয়েই তাঁর কবিতা ঝরণার মত উচ্ছ্বসিত কলধ্বনিতে ব্যক্ত হয়েছে। 'কড়ি ও কোমল' সেই গানেরই প্রস্রবণ। পৃথিবী ও তার মানবজীবন তাঁর আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই বিদায় চান না এই অপরূপ ধারণার কোল থেকে যেখানে অন্তহীন মানবজীবনস্রোত অখন্ড ধারায় এগিয়ে চলেছে, তার নিজের মত করে।

### শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

জীবনস্মৃতির অনেকটাই জুড়ে আছে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ। দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা কালে আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়, তিনি কেমব্রিজে যাচ্ছিলেন ব্যারিষ্টার হবার জন্য। কয়েকদিন তাঁরা পরস্পরের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন তাঁর সান্নিধ্যে। বিলাত থেকে ফেরার পর তাঁদের পরিবারের সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে আশুতোষ চৌধুরী আরও ঘনিষ্ঠ হন। তখন তিনি ব্যারিষ্টারী করে বিশেষ অর্থোপার্জ্জন না করলেও সাহিত্যচর্চায় ক্লান্তি ছিল না। বিরাট পড়াশুনা বা গ্রন্থাগারপ্রীতি—এগুলি কিছুই ছিল না তাঁর; কিন্তু বিদেশী সাহিত্যের যে নির্যাসটুকু তিনি পেয়েছিলেন তাকেই উপলব্ধি করা যেত। ফরাসী কাব্যসাহিত্যে তাঁর উৎসাহ ছিল। মানবজীবনরস সমৃদ্ধ 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতাগুলিতে তিনি কোনো কোনো

ফরাসী কবির সঙ্গে মিল দেখতেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন জীবনের দ্বার খুলে প্রবেশ করার যে অপরিতৃপ্ত বাসনা, সেই অতৃপ্তিই 'কড়ি ও কোমলে'র মুল ভাব। আশুতোষ চৌধুরী উৎসাহভরে এই কবিতাগুলি সাজিয়েছিলেন। প্রথমেই ছিল—'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'— এখানেই কবির জীবনেরপিপাসা উৎসারিত হয়েছে। বাল্যের বন্ধুত্ব ঘুচে গেছে যৌবনে এসে তবুও তাঁর মনে হচ্ছে জীবনের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়েই তিনি কাটিয়ে দিচ্ছেন, ভিতরে যাওয়ার অধিকার তখনও হয়নি।

**কড়ি ও কোমল**

রবীন্দ্রনাথ একটি অভিজাত পরিবারের সন্তান বলেই যে সকল মানুষের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারেননি, একথা শুনলেও তাঁর আক্ষেপ ছিল না, কারণ অনুমানটি সত্য নয়। কারণ জীবনের মাঝখানটাও বাঁধা পুকুরের মত, ছোট ছোট গন্ডীতে বাঁধা বিচ্ছিন্নতায় ঘেরা সেই জীবন। ভৃত্যরাজকতন্ত্রে খড়ির দাগের মধ্যে বসে যে উন্মুক্ত জীবনটির জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে থাকতেন, যৌবনে এসে সেই তাকেই ধরতে চেয়েছেন। 'সে যে দুর্লভ, দুর্গম, দূরবতী'। কবিরে এই বিষণ্ণতা কিন্তু নৈরাশ্য সৃষ্টি করেনি তাঁরমনে। 'কড়ি ও কোমল'এ তিনি যথেষ্টই স্পর্শকাতর ছিলেন। বর্ষার পর যেমন শরৎ নিয়ে আসে নতুন ফসলের সম্ভার, 'কড়ি ও কোমলে সেই ফসলের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। এবার আরও বিস্তৃত হবার ব্যাকুলতা।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, জীবনের বিচিত্রের গতিপথে একটার পর একটা স্তর অতিক্রান্ত হয়েছে। মানবজীবনের জয়-পরাজয় ভালোমন্দের একটা ঘূর্ণাবর্তে পড়া যে জীবন, তার ভার বড় কম নয়, এই নতুন চেতনার সূচনাতেই তিনি তাঁর স্মৃতিলেখার পাতা বন্ধ করেছেন।

কঠিন পথের যাত্রার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সত্তার বিকাশের একটি অস্পষ্ট অনুভূতির কথা বলেছেন। ''আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটিঅন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই।'' তিনি জীবনচরিত লেখেননি, তাঁর অনুভূতিপ্রবণ শিল্পীমনের আনন্দময় সত্তাটির ক্রমবিকাশের যে ইতিহাস, তারই উন্মোচনের অভিপ্রায় নিয়েই বোধকরি এই স্মৃতিচিত্র। জীবনের পর্বে কোথাও মন বর্ণময় হয়ে উঠেছে, কোথাও জীবনের কোলাহল থেকে দূরে সরে গেছে, সেইসঙ্গে ঘটেছে সমকালের বহু মনীষীর সংস্পর্শ, গতানুগতিকতার বাইরে অবস্থান, নতুন সৃজনের তীব্র আকাঙ্খা— সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের মানসবিকাশের রূপ ধরা পড়েছে বিভিন্ন পর্বের সমহারে। 'জীবনস্মৃতি' থেকে আরম্ভ করে 'ছেলেবেলা' ও 'আত্মপরিচয়ে' যে উপলব্ধি তা রবীন্দ্রনাথের জীবনের মহান অভিপ্রায়ের পরিচয়বাহী হয়েছে।

## ৫.৪ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে স্মৃতিচারণের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ

'নবজাতক' কাব্যের সূচনার একটি অংশে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ফুল চোখে দেখবার আগেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারিদিকের হাওয়ায়।" 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের এমনই একটি বৃত্তান্ত যেখানে পর্বে পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনভূমিতে সেই 'ফুলগন্ধ'কে ছড়িয়ে দেবার আভাস রয়েছে। অপরিণত মন সেই সৌরভকে একভাবে গ্রহণ করেছে, আবার পরিণতির দিকে যত অগ্রসর হয়েছে, মননজাত অভিজ্ঞতা ততই নির্যাসটুকু বার করে নানা ভঙ্গীতে কাব্যসৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে। এই পালাবদলে বৈচিত্র্যের সন্ধান থাকলেও কবিজীবনের প্রথম লগ্ন থেকে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কাব্যধারায় একটা সংযোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। সেটি হচ্ছে সবরকম বন্ধনমুক্তির প্রেক্ষাপটে জীবনের বিপুল গতিবেগ, সৌন্দর্যের উপলব্ধি ও সেই আনন্দানুভূতির মধ্য দিয়ে সত্যবোধের প্রতিষ্ঠা।

'জীবনস্মৃতি'র বিভিন্ন অধ্যায়ে কবির অভিজ্ঞতায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বিশেষ তাৎপর্যবাহী, আত্মবিকাশের আনন্দ সেখানেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সেইটুকুতেই সবটা নিবদ্ধ নয়, সরস কৌতুক নিয়ে বর্ণিত শিক্ষারম্ভের পর্ব থেকে দেখতে হবে। সেখানে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার যে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ, তার প্রভাব রয়েছে পরবর্তীকালের অনেক কবিতায়। 'শিক্ষারম্ভ' দিয়ে তিনি আরম্ভ করেছেন। সেই স্মৃতির দিকে বার বার ফিরে দেখেছেন পরম মমতা নিয়ে। জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে লিখছেন 'আকাশপ্রদীপ' কাব্য, সেখানে "দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা নয়ন ছলোছলো" (আকাশপ্রদীপ)। তখনও 'ছেলেবেলা' লেখেননি। জীবনবৃত্তান্তকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন একটি গ্রন্থে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। তাই প্রশ্ন জাগছে—

'স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কি অর্থ ইহার মনে ভাবি।

বার্ধক্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই শিশুমনের স্মৃতি মন্থন করছেন—

"মনে পড়ে ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে
ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে। (যাত্রাপথ)

কিম্বা— "মাষ্টারি শাসন-দুর্গে সিধকাটা ছেলে
ক্লাসের কর্তব্য ফেলে
জানি না কী টানে
ছুটিতাম অন্দরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে"। (স্কুল-পালালে)

এ যেন 'জীবনস্মৃতি'র গদ্যভাষা। স্মরণ করছেন—পাতালের নাগলোক, বৃদ্ধ বট, বাড়ীতে নতুন বৌ আসা যে কবির মনকে "বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় করে"—। 'বধূ' কবিতাটির অন্তরালে একটি কাহিনীর অনুভূতি রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের সাবেক কালের খাজাঞ্চী কৈলাস মুকুয্যে ভারি রসিক লোক। তাঁর দ্রুতবেগে ছড়া বলা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করত। "সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল।" সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলায় ঝলকের মন মেতে উঠত। তাছাড়া 'বধূ' কবিতায় প্রথম ছত্রে 'ঠাকুরমার' শব্দটি 'মুকুজ্জে' শব্দটির পরিবর্তে ছিল এবং তিনি নিঃসন্দেহে কৈলাস মুকুয্যে।

বালক রবীন্দ্রনাথের ছাদে এসে যে চারিদিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জীবনস্মৃতিতে 'ধ্বনি' কবিতাটিও সেই স্মৃতি বহন করে লেখা। শুধু তফাৎ হচ্ছে 'জীবনস্মৃতি'র সরস মনটি বাস্তবের অনেক কঠিন অভিজ্ঞতা পেরিয়ে যখন বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছে তখন পুরোনো দিনের কথায় বেজে উঠেছে এক বিষণ্ণ বেদনা—

'আগেকার দিন আর আজিকার দিন
পড়ে আছে হেথা হোথা একসাথে সম্বন্ধবিহীন'।

'ঘর ও বাহির' অংশে রবীন্দ্রনাথ গন্ডীবাঁধা জীবনের কথা জানিয়েছেন এবং সেই অনুভূতি থেকেই উৎসারিত হয়েছে 'সোনারতরী'র 'দুই পাখি' কবিতাটি, যেখানে বালকের প্রাণে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যে অবগাহন করার ব্যাকুল বাসনা থেকে একটা অক্ষমতার দুঃখ জেগে উঠেছে—'হায় মোর শকতি নাহি উড়িবার'।

আবার স্মৃতিগুলি যখন ছবির মত একটির পর একটি রচনা করেছেন, সেইকালে লেখা কিছু কবিতা পাঠকের কাছে বিশেষ পরিচিত নয়। যেমন, 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ 'দিল্লি-দরবার' বলে একটি কবিতার উল্লেখ করেছেন। পরে অবশ্য এই বিষয় নিয়ে গদ্যপ্রবন্ধ লিখেছিলেন। ৮ই ফাল্গুন, ১২৮৩ তে হিন্দু-মেলা প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি পড়েছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বে তা আর প্রকাশ করা হয়নি। কারণ সে রাজত্ব তখন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত, সময় ১৮৭৭, রবীন্দ্রনাথ তখন কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে। সেই সময় থেকেই পরাধীনতার অপমান জেগে উঠেছে তাঁর মধ্যে—'প্রলয়কালের নিবিড় আঁধার ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে'। কবিতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বপ্নময়ী' কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন, শুধু 'ব্রিটিশ' শব্দ পরিবর্তন করে 'মোগল' ব্যবহৃত হয়েছিল। অনেকদিন পরে রবীন্দ্রনাথকে দেখাতে তিনি কবিতাটি হিন্দুমেলায় পঠিত কবিতা বলে বুঝতে পেরেছিলেন।[১] সেই ঘোর দুর্দিনে স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধা পড়ার উৎসবের শরিক হতে পারেননি সেই অপরিণত কবি—

'ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা যে
গায় গাক আমরা গাব না,
আমরা গাব না হরষ গান, ....."

আবেগমথিত এই অসন্তোষ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় তীব্র ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

এই উত্তেজনার বিপরীত চিত্রও আছে পৌলবর্জিনীর কাহিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল বিহারীলাল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায়। বিশুদ্ধ স্নিগ্ধ প্রকৃতির আশ্রয়ে পল ও ভার্জিনিয়ার প্রেমের কাহিনী বালক রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। রবীন্দ্রকাব্যে নিসর্গচিত্র মূলতঃ বঙ্গভূমিকে ঘিরে। পৌলবর্জিনীর সমুদ্রে, পাহাড় উপত্যকার বর্ণনার সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য। সুদূরের দিকে যে মন সবসময়েই ধাবিত হবার কল্পনা করে, এখানে তার আকর্ষনও বড় কম ছিল না। যে চঞ্চলতা তাঁর দৃষ্টিকে দূর থেকে দূরান্তরে নিয়ে গিয়েছিল, তার উৎস এইখানেই নিহিত। নরনারীর স্নেহ-ভালবাসা-বিচ্ছেদ বেদনা এখানে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম; জীবনের উদ্দামতা অপেক্ষা তার সরল গতিপথ সেই বালককে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর ছোটগল্পগুলিরও অনেক সূত্র রয়েছে এখানে। সেইসঙ্গে আছে তাঁর কৈশোরের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা নারকেল গাছগুলি, যেগুলি ব্যবহার করেছেন পৌলবর্জিনীর তালগাছের পরিবর্তে। কাব্যকবিতার মনোহর গীতিময় সুরটি কবিহৃদয়ের ধরা ছিল পৌলবর্জিনীর কাহিনী থেকে। কবিজীবনের প্রারম্ভিক পর্বে তিনি যে বনফুল কবিকাহিনী লিখেছিলেন সেখানে প্রকৃতির পটভূমিতে নরনারীর দ্বন্দ্বময় জীবনের চিত্র; অনেকটাই তাঁর পূর্বসুরীদের গাথাকাব্যের অনুকরণ। কিন্তু সেই শৃঙ্খল ভেঙে তিনি বেরিয়ে এলেন

---

১. দ্রঃ — রবীন্দ্ররচনাবলী (ষোড়শ খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ২৫ শে বৈশাখ, ১৪০৮, মে ২০০১ পৃ. ৫০০

'সন্ধ্যাসংগীত' রচনা করতে গিয়ে। সৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের অনুগত করার তাগিদে এক বিষণ্ণ সুরমূর্ছনার সৃষ্টি হয়েছে এখানে। সন্ধ্যাসংগীতের অনেক আগেই তিনি লিখেছিলেন 'ভগ্নহৃদয়', কবিকাহিনী ও বনফুল। এই রচনাগুলির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কুণ্ঠিত ছিলেন। 'বনফুল'কে তিনি বলেছেন কাঁচা হাতের লেখা। "কিন্তু কবিকাহিনীতে ভগ্নহৃদয়ে অল্পস্বল্প পাক ধরেছে এই জন্যেই ওদের কৃত্রিম প্রগলভতাকে বলা যায় জ্যাঠামি। সদরে তার প্রদর্শনীটা ভাল নয়। .....আদুরে সাহিত্য তাতে মেয়ের প্রশ্রয়ই বেশি, বেশ একটু আর্দ্রভাবের সেন্টিমেন্টালিটি। বাল্যযুগের পরবর্তী আমার সাহিত্য, বিশেষত সন্ধ্যাসংগীত আদিতে সেই স্যাঁতসেতে ভাব রোগের মত লেগে আছে। আছে তাতে সাধারণের দরদ পাওয়ার আগ্রহ। সেটা ক্রনিক হয়নি এই আমার রক্ষা, নইলে কোনকালে সেই রুগ্ন (রুগ্‌ণ) কাব্যের নাড়ী ছিঁড়ে যেত।" ১৯৩৮ সালে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে এই মন্তব্য করেছিলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে প্রধানত তিনটি কাব্যের কথা বলেছেন, যেগুলি কবির মনের বিকাশ ও বিবর্তনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত এবং কড়ি ও কোমল কাব্যের উল্লেখ করেছেন, প্রত্যেকটির প্রেক্ষাপটে তাঁর মনের এক একটি বিশেষ অবস্থা ধরা পড়েছে। এক বিচ্ছেদবেদনাকে হৃদয়ে ধারণ করে আত্মনিমজ্জিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে, আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। তাঁর মতে কবিকাহিনী (১৮৭৮) থেকে কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) পর্যন্ত তাঁর মনোভঙ্গীর স্বাধীন বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লক্ষ্যকরা যায় যে, কাব্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের অস্ফুট প্রতিফলন। বিশ্বসংসারকে দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু অপরিণত অভিজ্ঞতায় সেযুগের কাব্যরীতিকে অনুকরণ করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "কাঁচা বয়সে পরের লেখা মক্‌শ করে আমরা অক্ষর ছেঁদে থাকি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মধ্যেও নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ হতে থাকে। অবশেষে পরিণতিক্রমে সেইটেই বাইরের নকল খোলসটাকে বিদীর্ন করে স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। প্রথম বয়সের কবিতাগুলি সেইরকম কপিবুকের কবিতা"।[২] সুতরাং বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়সের লেখাগুলি নিয়ে সঙ্কুচিত হলেও, তাঁর অভিজ্ঞতার বিপুল পরিধির সঙ্গে জড়িয়ে এই কাব্যগুলির ভাব ও ভাষা এক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। 'সন্ধ্যাসংগীত' বিশ্লেষণে যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষণ্ণতা থাকুক, 'জবিনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে এতদিনে তিনি এমন একটি রচনা করছেন যা তাঁর একান্তই নিজস্ব, অর্থাৎ পূর্বসূরীদের কাব্যরচনা রীতি থেকে তিনি সরে এসেছেন। শব্দতত্ত্বের ঔৎসুক্য থেকে ব্রজবুলি ভাষায় ভানুসিংহের পদাবলী লিখেছেন। এককথায় তিনি নানাভাবে কবিতায় তাঁর স্বাধীন সত্তাকে ভাষায় রূপ দিতে চাইছেন। 'প্রভাতসংগীত' সেই নিষ্ক্রমণের ইতিহাস, যার বিস্তৃত বর্ণনা 'জীবনস্মৃতি'তে রয়েছে।

ভোরের সূর্যোদয় থেকে তাঁর আত্মসত্তার আকস্মিক জাগরণে বিশ্বসৌন্দর্য এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কুয়াসা ভেদ করে ফুটে উঠল। 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে পাই—'একটি অদ্ভুত অভূতপূর্ব হৃদয়ানুভূতির দিনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে? এই অনুভূতি কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দাঁড়ানো কবির পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তাঁর কাব্যরচনার ধারা তখন 'খেয়া'য় এসে পৌঁছেছে। সেই পর্ব পর্যন্ত কবির অভিজ্ঞতায় তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যটির, আবদ্ধ গুহামুখ থেকে প্রবল বেগে নিঃসৃত জলরাশির মত অবিশ্রান্ত গতিতে বয়ে চলেছে তাঁর সৃষ্টিধারাতে। সন্ধ্যাসংগীতের বিষণ্ণতা মুক্তির আনন্দে রূপান্তরিত হল। সেই আনন্দ থেকে যে আলোর ছটা দেখা দিল, সেই আলোই উজ্জ্বলতর হয়েছে তাঁর মহাসত্যের উপলব্ধি। ১৯৩০ সালে দেখা মানুষের ধর্মের অন্তর্গত 'মানবসত্য' প্রবন্ধে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র প্রেক্ষিতে সত্যবোধের এক তত্ত্বগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যখন প্রভাতসংগীত লিখেছিলেন, তখন কিন্তু একটি বিশেষ আবেগের দ্বারাই

---

১. দ্রঃ — রবীন্দ্ররচনাবলী (ষোড়শ খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ২৫ শে বৈশাখ, ১৪০৮, মে ২০০১ পৃ. ৪৮৬
২. দ্রঃ প্রভাতসংগীত (১৮৮৩)

চালিত হয়েছিলেন, তত্ত্ব সেখানে ছিল না। সেখানে স্বপ্নভঙ্গো নির্ঝর তার প্রবল গতিবেগ নিয়ে সব বাধা চূর্ণ করে ধাবিত হয়েছে সামনের দিকে, এক মহামিলনের আহবানে। একটি মনোগ্রাহী আলোচনার অংশ উদ্ধৃত করছি—"নির্ঝরের এই আবেগ যাতে কবিব্যক্তিত্বের ভাবনাই প্রকাশিত হয়েছে, অন্যত্র বহু কবিতায় তা ফুটে উঠেছে জীবনের প্রেমে মানুষের সঙ্গো মানুষের মিলনের আকাঙ্ক্ষায়, সৌন্দর্যের মগ্নতায়। ছিন্নপত্রে এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তিনি যখন বলেন 'ওই যে পৃথিবী ওকে এমন ভালবাসি' চিত্রায় যখন সৌন্দর্যরূপিনীর সৌন্দর্যের আবাহন করেন, বলাকায় যখন ঋতুচক্রের নিত্য আবর্তনে মুগ্ধ হয়ে যান, তখনই আমরা বুঝি নির্ঝরের এই স্বপ্নই সার্থক হয়ে অসাধারণ কাব্যরূপ লাভ করেছে।"[১] বিদেশভ্রমণ থেকে ফিরে এসে গতিবাদের যে দার্শনিক চেতনা বলাকা পর্ব (১৯১৬) থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল, সেই গতিচেতনা প্রথমাবধিই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবনবিশ্লেষণে অনুভূত হয়। তিনি এক জায়গায় স্থির থাকেননি, এক বোধ থেকে আরেক বোধে উত্তীর্ণ হয়েছেন; এক চিরসজীব, চিরনূতন জীবনভঙ্গি আত্মস্থ করেছেন, যে জীবন "উল্লাসে ছুটিতে চায়"। সেই দুরন্ত যাত্রায় তাঁর গভীর মর্ত্যপ্রীতি ও সেইসঙ্গে সুন্দরকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে তাকে নিত্যনতুন রূপে ব্যক্ত করেছেন তাঁর সৃজনে। 'সোনার তরী' থেকে 'বলাকা' সর্বত্রই এই গতিচেতনা। নাটকগুলিও সেই অর্থে এক বাঁধভাঙা উল্লাসকে নিয়ে এসেছে, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী সর্বত্রই—

অচল শিলার ভ্রুভঙ্গিমায়
বাজাই চপল করতালি।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যটির পটভূমি বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতির বিচরণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছেন। 'কড়ি ও কোমল' দুই বিপরীত ঠাটের সুরধ্বনি থেকে একদিকে যেমন ব্যক্ত হয়েছে এক শোকাহত কবিমনের গভীর বেদনা জগতের মাঝখানে বেরিয়ে আসতে না পারার বিষণ্ণতা তেমনই আবার দেখা দিয়েছে কবির প্রবল মর্ত্যপ্রেম—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। কিন্তু এই বৈপরীত্য 'কড়ি ও কোমলে' প্রথম নয়। সন্ধ্যাসংগীতে সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকারে যে বিষাদে তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন, প্রভাতসূর্যের প্রথম আলো তাঁকে নিয়ে এল বন্দীগুহামুখ থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরে। 'প্রভাতসংগী'তে সেই গানেই মুখরিত। এই দুই সুর 'কড়ি ও কোমল' নামে অভিব্যক্ত হয়েছে। বহু বিদগ্ধজনের রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে বার বার। তার মধ্যে একটি উল্লেখ করে 'জীবনস্মৃতি'র শেষ পর্ব সমাপ্ত করছি। "দুঃখ ও মৃত্যুর উপলব্ধি কীভাবে কবির মনে জীবনের প্রতি উচ্ছ্বাস এবং প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বরের প্রতি প্রবল অনুরাগকে প্রভাবিত করেছে,, কেমন করে তাঁর জীবনদর্শনকে স্বপ্নাল্পতা ও ভাবাবেগপ্রবণতা থেকে মুক্ত করে ক্রমশঃ গভীর, কঠিন, আত্মসচেতন এবং আত্মকৌতুকময় করেছে—সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যকে তার বিস্তারিত ইতিবৃত্ত ভাবা যেতে পারে।[২]

## ।। রবীন্দ্র-জীবনবৃত্তান্তের তিনটি আধার—
## জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা ও আত্মপরিচয় ।।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের বহুমুখী ঘটনা, সেই পটভূমিতে তাঁর মনোবিকাশ এবং জীবনের তাৎপর্য নিয়ে বিশ্লেষণ, তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা ও তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে লেখা কিছু প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধগুলি পরবর্তীকালে আত্মপরিচয় নামে প্রকাশিত হয়েছে। জীবনস্মৃতি তিনি লিখেছেন প্রবাসীতে, ১৯১১ সালে। তার আগের একটু ইতিহাস আছে। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একটি আত্মপরিচয় দেন, যা নিতান্তই বিবরণধর্মী। সেই বিবরণটি জানা স্মৃতিচিত্রে ব্যক্ত হয়েছে 'জীবনস্মৃতি'তে।

---

১. কবি তব মনোভূমি—ড. ভবতোষ দত্ত (আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা) পৃ. ৩৩
২. আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—দ্বিতীয় সংস্করণ—আবু সইয়দ আয়ুব, প. ২৭

সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আকিয়া যায় জানি না। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি অনুভূতি ও মনের ক্রপরিণতির একটি সুসংলগ্ন ইতিহাস ছড়িয়ে আছে জীবনস্মৃতির বিভিন্ন অধ্যায়ে। যদিও রবীন্দ্রনাথ কোনো সাল তারিখ উল্লেখ করেননি, কিন্তু জীবনের বহু ছোট ছোট ঘটনার পটভূমিতে তাঁর শিশুকাল থেকে আরম্ভ করে যৌবনের প্রবেশ পথে পৌঁছে আর তিনি এগিয়ে যাননি; তবুও রেখে গেছেন তাঁর সাহিত্যসাধনার বহু সূত্র, তার পটভূমি, তার ব্যাখ্যা। জীবনের বৃত্তান্ত আছে কিন্তু ইতিহাসের বর্ণনার মত তার ধারাবাহিকতা নেই, এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন। আরও বলছেন যে জীবনের অনেক চিত্রই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, কিন্তু প্রকাশের সুযোগ সংক্ষিপ্ত। রবীন্দ্রনাথ অতীতচারণ করলেন তাঁর প্রৌঢ়ত্বের দরজায় পা দিয়ে, সেখানে অতীতের সঙ্গে গভীর মমতার সম্পর্ক, কিন্তু তার থেকেও বেশি সেই পরিপ্রেক্ষিকায় এক শিশুমনের বিবর্তনের চিত্র। সেখানে দেখার আনন্দ আছে, কিন্তু ঝড় তোলেনা মনের সমুদ্রে।

ছেলেবেলায় জীবনস্মৃতির কিছু কিছু অংশ পুনরক্ত হয়েছে। যেমন শিক্ষারম্ভের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে ছেলেবেলার সূচনাতে যে মাষ্টারমশাইএর কাছে প্যারী সরকারের ফার্ষ্ট বুক পড়া শিশু রবীন্দ্রনাথের চোখে গভীর ঘুম নিয়ে আসত, কিছুতেই তা ঠেকানো যেত না। মাষ্টার পন্ডিত সকলেই হাল ছেড়ে দিয়ে বুঝেছিলেন লেখাপড়া শেখার বাঁধা রাস্তায় তাঁকে চালানো যাবে না। জীবনস্মৃতির একরম অনেক ঘটনাই ছেলেবেলাতেও বলেছেন, সেইসঙ্গে পরিবার এবং পরিবারবহির্ভূত অনেক মানুষের কথা তাঁর কাব্যরচনা চর্চা, বিলাত যাত্রার কথা দিয়ে শেষ করেছেন। অনেক কাহিনী নতুন করে বলা হলেও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে লেখা হয়েছে জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা দুটিই স্বমহিমায় উজ্জ্বল। কিন্তু দেখার চোখ এবং বলার ভঙ্গিতে দুটি গ্রন্থ স্বতন্ত্র। ছেলেবেলার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা—সরোবরের সঙ্গে ঝরণার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী, এ হল বাকলি, সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে"। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন ছেলেদের জন্য কিছু লিখতে। "ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের" কথা লেখার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জাগে। তখন রবীন্দ্রনাথ মংপুতে বাল্যস্মৃতির স্পর্শকাতর অনুভূতি নিয়ে লিখছেন ছড়া। ছেলেবেলার ভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাথ এই রচনার বিষয়বস্তু তার উদ্দেশ্য ও বিচারবিশ্লেষণ করে গেছেন। বক্তব্যের দিক থেকে জীবনস্মৃতির সঙ্গে পার্থক্য হচ্ছে যে, "এই বিবরণটিকে ছেলেবেলার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয়নি—কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর বয়সে মুখোমুখি এসে পৌঁছেছে।" জীবনস্মৃতি যৌবনের প্রারম্ভে এসে থেমেছে। দুটি গ্রন্থের সমন্বয়ে পরিস্ফুট হয়েছে শিশু থেকে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশঃ তা পরিণত হয়ে উঠেছে। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিমনের ভিতটি গড়ে উঠেছে, আর জীবনস্মৃতিতে তার ওপর কারুকার্যময় প্রাসাদ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ফুটে উঠেছে তাঁর প্রথম জীবনের রচনাগুলির উল্লেখের মধ্য দিয়ে।

প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে জীবনের স্মৃতিচারণে, কথায় ছবি আঁকার যে নেশা, সে নেশা তাঁর সারাজীবনের সৃষ্টিতে ছড়িয়ে আছে ছেলেবেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। জীবনস্মৃতি সাধুভাষায়, আর ছেলেবেলা চলিত ভাষায় লেখা, রবীন্দ্রনাথ বলছেন 'বালভাষিত গদ্যে'। তবে রচনারীতিতে গদ্যের একটা ঋজু অথচ নমনীয় ভঙ্গী আছে যাকে প্রমথ বিশী বলেছেন দীর্ঘবিতানিত তা নমনীয় কণ্ঠস্বর।

জীবনস্মৃতিতে জীবনকে যেভাবে দেখেছেন, সেইভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন, এ তাঁর নিজের আঁকা ছবি, কিন্তু দূর থেকে দেখা। আর "ছেলেবেলা রূপকথার জগৎ, সে যেন আর কাহারো সৃষ্টি, তাহার উপরে কবির কোন কর্তৃত্ব যেন নাই। আর দশজনের মত তিনিও একজন দর্শকমাত্র। এমন হইবার কারণ, কবির বাল্যকাল ও এই গ্রন্থরচনার মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। শুধু তাই নয়, কবির ছেলেবেলার সেই যুগ, সেই আবহাওয়া, সেই সব নরনারী কবে

বাস্তবলোক হইতে অপসারিত হইয়া কবির মনোলোকে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। বাস্তব রূপ ছাড়িয়া তাহারা আজ যে-রূপ গ্রহণ করিয়াছে সে রূপকথার জগৎ"।[১] জীবনস্মৃতিতে যে কথা বা যে অনুভূতির সংকেত রেখে গেছেন ছেলেবেলাতে তার স্পষ্টতা অনেক বেশি, কিন্তু সেখানে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ নেই, যে কোনো রূপকথার ভাষ্যকার তিনি। তাই বলার রীতিতেও পরিবর্তন এসেছে। জীবনস্মৃতিতে বাস্তব প্রত্যক্ষ জীবনের কথা বলায় সাধুগদ্যের অন্তরালে একটা মৌখিক কথ্যভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। ছেলেবেলার ভাষাতেও কোনো তত্ত্বগত আলোচনা নেই, যা কথ্যভাষায় লিখিত হলেও রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাতেই দেখা যায়। একটি সুন্দর বক্তব্য রয়েছে এই প্রসঙ্গে। "আশ্চর্য ভাষা ছেলেবেলার। ছোটো ছোটো বাক্য, হসন্তের কলধ্বনি, উপমার পরিমিত প্রয়োগ, সর্বোপরি কথাগদ্যের যা প্রধান সার্থকতা—বক্তা মনের আচ্ছন্নতার চেয়ে বর্ণনীয়ের স্পষ্টতা। তাঁর দুটি আত্মজীবনী দুই রীতির চরম সিদ্ধি—সাধুরীতিতে 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) চলতি রীতিতে 'ছেলেবেলা' (১৯৪০)। দুটিই ছবি আঁকা।[২]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মপরিচয়মূলক ছটি লেখা সংকলিত হয়ে 'আত্মপরিচয়' নামে প্রকাশিত হয় ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ বিশ্বভারতী থেকে; সংকলন করেন পুলিনবিহারী সেন। লেখাগুলি ধারাবাহিক নয়, বিভিন্ন সময়ে লেখা। এখানে পরিণতমনন রবীন্দ্রনাথের জীবনকে দেখার বিশ্লেষণাত্মক পটভূমিতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনপরিচয় কিছু কিছু ব্যক্ত হয়েছে। জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলায় যেমন পারিপার্শ্বিক জীবনবিন্যাসের প্রেক্ষাপটে কবিমানসের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, আত্মপরিচয় গ্রন্থে অপরিণত মনকে বর্ণনা করার সহজ কৌতুকরসটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, পরিবর্তে কবির অন্তরস্থ জীবনদেবতা কীভাবে তাঁকে জীবনের পরম লগ্নে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেখানে মর্ত্যজীবনের সব অপূর্ণতা এক পরিপূর্ণ অখন্ড ঐক্যের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে।

'আত্মকথা'[৩] প্রবন্ধটি জীবনস্মৃতি রচনার আগে লেখা। অনুরোধ আসে, তাঁর জীবনবৃত্তান্ত লেখার জন্য। যদিও তিনি শ্রী পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্রে সংক্ষেপে তাঁর জীবনের কিছু বিবরণ দিয়েছিলেন, কিন্তু 'আত্মকথা'য় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই তাঁর জীবনকাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে সম্মত হননি। এখানে তিনি তাঁর কাব্যসাধনার স্তরগুলিকে বিশ্লেষণ করে আপাতখন্ডতার মধ্যেও এক 'অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য' উপলব্ধি করেছেন। জীবনস্মৃতি এবং ছেলেবেলারও অন্তর্নিহিত মূল সুরটি এই ঐক্যবোধে। সেখানে কোনো তিক্ততা নেই, কোনো জটিলতা নেই; এক নিবিড় ভালবাসার স্বচ্ছ প্রেরণা নিয়ে জীবনপ্রবাহ চালিত হয়েছে। আত্মকথাতেও সেই 'প্রেমলীলার উদবেল তরঙ্গমালা'। কিশোর বয়স থেকেই যে প্রকৃতির শ্যামল সুন্দর রূপ তাঁকে আবিষ্ট করে রাখত, সে স্মৃতি ধরা রয়েছে মনের গভীরে। ভাষা তখনও অস্ফুট, জীবনস্মৃতিতে তাঁর কাব্যরচনার সূচনাপর্বে তিনি জানিয়েছেন সে কথা। কিন্তু বাধাবন্ধনহীন নির্ঝর আত্মপ্রকাশ করল, তখন থেকেই নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির অখন্ড যোগসূত্রটি অনুভব করেছেন। 'আত্মকথা' কবির মনের সেই আলো ফুটিয়ে তুলেছে, জীবনস্মৃতি আর ছেলেবেলার কথাতে তার পটভূমিটি রয়েছে। সেইসঙ্গে বলছেন, কবির জীবনের সাধারণ ঘটনায় সেই অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম হয় না—'কবি রে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে'।

"আত্মপরিচয়ের দ্বিতীয় রচনা 'অভিভাষণ'—ভারতীতে প্রকাশিত, ফাল্গুন ১৩১৮ সালে, তৃতীয় রচনা 'আমার ধর্ম' ১৩২৪ বঙ্গাব্দে সবুজপত্রে আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় স্থান পেয়েছিল। খুব সহজভঙ্গীতে যে কথা জীবনস্মৃতিতে বলেছিলেন, তার আরও সম্প্রসারিত রূপ এই রচনাটি। নিজের প্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির গভীর পরিচয়ের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই, কিন্তু পূর্ণতা আসে তার সঙ্গে বিশ্বমানব যুক্ত হয়ে। ধর্মবোধ নিয়ে একটা তত্ত্বগত আলোচনাই

---

১. রবীন্দ্র-বিচিত্রা—প্রমথনাথ বিশী, জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা, পৃ. ১৪৯

২. রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা—ড. ভবতোষ দত্ত, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৮; পৃঃ ১১৬

৩. উৎস—বঙ্গভাষার লেখক (১ম ভাগ) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভাদ্র ১৩১১

এখানে মুখ্য, অপরপক্ষে জীবনস্মৃতি সম্পূর্ণভাবেই তত্ত্বভারমুক্ত।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ এ প্রকাশ করছে 'কবির অভিভাষণ' যেখানে মূল প্রতিপাদ্য 'একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবিমাত্র'। জীবনস্মৃতি তাঁর কাব্যসাধনার পর্বগুলি চিহ্নিত করেছে, কিন্তু বলিষ্ঠ প্রত্যয়বোধে বালক থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রতিষ্ঠিত হননি। নাগরিক জীবনের মহাকোলাহল বদ্ধ পরিবেশ তাঁকে আঘাত দিত, ছেলেবেলা ও জীবনস্মৃতিতে তাঁর স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে সেইসঙ্গে রয়েছে উন্মুক্ত জীবনে মুক্তির আনন্দে নিজের সত্তার পূর্ণবিকাশের অভিপ্রায়। জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে "মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে" তিনি রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিশুমনের প্রতি পীড়নকে তিনি কোনোদিনও ভোলেননি। তাই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য তিনি জানিয়েছেন। "প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভ-রূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি সূচনায় সে ঊষারুণ দীপ্তি যে নবোদগত উদ্যমের অঙ্কুর, তাকে অবারিত করার জন্য আমার প্রথম প্রয়াস.....।" এই প্রয়াসের পটভূমিটি ছড়িয়ে আছে তাঁর জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলার স্মৃতির পাতায়। তবে শিশু কবি বন্ধনকে যেমন স্বীকার করেননি, তেমন আবার শাস্তিও পাননি তার জন্যে। তাঁকে সবদিক থেকে সুশিক্ষিত করার প্রবল আগ্রহ দেখেছি তাঁর অগ্রজদের মধ্যে। জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলায় পরিবারের পরিচয় তাঁর সুপরিণত অভিজ্ঞ জীবনদর্শনের প্রেক্ষাপটে যথাযথভাবে ব্যক্ত করেছেন। পুরাতন ও নূতনের সন্ধিলগ্নে তাঁর জন্ম। তবুও "যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত।..... আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল....."। জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলার নানা প্রসঙ্গের উপস্থাপনায় তাঁর পরিবারের গতানুগতিকতার বাইরে অবস্থানটি বোঝা যায়। আত্মপরিচয়ে সে রকম কোনো ঘটনার বিস্তৃত উল্লেখ নেই শুধু সংকেতটি আছে সেখানে। সব অনুভূতি ও বিশ্লেষণ তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ সালের প্রবাসীতে প্রকাশ পেল তাঁর 'জন্মদিন' রচনাটি। বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের মন ও বিশ্বজগৎ পরস্পর সংযুক্ত; তার জন্য যে আনন্দের সহজ প্রকাশ, তার সঙ্গে কবির অতি নিবিড় সম্পর্ক। তাঁদের সাবেককালের বাড়ীতে ছোটবেলার স্মৃতির টুকরোগুলি তাঁর মনে অসাধারণ কল্পনার জাল বোনে। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন বন্ধ দরজার ছিদ্র দিয়ে প্রকৃতির মায়াময় এক টুকরো সৌন্দর্যের দিকে। তাঁর একান্ত ভালবাসা দিয়েই কাব্যসৃষ্টি করেন। কিন্তু সে যাত্রাপথ মসৃণ নয়। তবুও তিনি থেমে যাননি, বার বার স্মরণ করেছেন তাঁর পরিবারের ভূমিকা, "সেখানে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটেনি"। কবি পৃথিবীকে সুন্দর দেখেছেন, মানুষের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন 'মানবের মাঝে' বেঁচে থাকার ব্যাকুলতা নিয়ে, উচ্চারণ করলেন এক মহৎ তাৎপর্যময় বাণী—

'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণির পদপরন তাদের পরে।

## ৫.৫ অনুশীলনী ঃ

১। শিক্ষার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরিচয় রয়েছে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা পর্বকে অবলম্বন করে অভিমতটি বিচার কর।

২। রবীন্দ্রমানসগঠনে তাঁর পরিজন পরিবেশের প্রভাব ও প্রেরণা নিরূপণ কর জীবনস্মৃতির প্রাসঙ্গিক অংশগুলি অবলম্বনে।

৩। ঠাকুরবাড়ীর বাইরে যে সব স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সৃষ্টিপর্বে প্রভাব বিস্তার করেছেন, এমন অন্তত তিনজন ব্যক্তির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ঋণস্বীকৃতির স্বরূপ ব্যাখা কর।

৪। "মনে করিয়াছিলাম জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু, দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা"। উদ্ধৃতাংশের আলোকে জীবনস্মৃতির স্বরূপ নির্ধারণ কর।

৫। "আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।" জীবনস্মৃতি অবলম্বনে মন্তব্যটির তাৎপর্য নির্ণয় কর।

৬। "জীবনস্মৃতি মূলত রবীন্দ্রনাথের লেখকসত্তার ক্রমবিকাশ, ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক উন্মোচন নয়"। বক্তব্যটির গ্রহণযোগ্যতা আলোচনা কর।

৭। সংক্ষেপে অধ্যায়গুলি আলোচনা কর—হিমালয় যাত্রা, গীতচর্চা, সাহিত্যের সঙ্গী, ভানুসিংহের কবিতা, স্বাদেশিকতা, বাল্মীকিপ্রতিভা, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, কড়ি ও কোমল।

## ৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি ঃ


১। রবীন্দ্ররচনাবলী (প্রথম, দ্বিতীয়, দশম থেকে একাদশ খন্ড) জন্মশতবার্ষিক সং ১৩৭৩ পঃ বঃ সঃ

২। রবীন্দ্ররচনাবলী (বোড়শ খন্ড) পঃ বঃ সঃ ১৪০৮

৩। রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম-চতুর্থ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৪। রবিজীবনী (প্রথম ও দ্বিতীয়) প্রশান্তকুমার পাল

৫। রবীন্দ্রবিচিত্রা — প্রমথনাথ বিশী

৬। রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা — ভবতোষ দত্ত

৭। কবি তব মনোভূমি — ভবতোষ দত্ত

৮। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ — আবু সইয়দ আয়ুব

৯। বাংলাসাহিত্যে আত্মজীবনী — সৌমেন্দ্রনাথ বসু

১০। সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ — নন্দরাণী চৌধুরী

১১। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি — পঁচিশে বৈশাখ ১৩৯৪ ও ১৩৯৬ সাহিত্যপত্র

১২। বিশ্বভারতী পত্রিকা — বর্ষ ২৪ — সংখ্যা ৪ বৈশাখ - আষাঢ়, ১৩৭৫

# একক ৬ ❑ 'গোরা' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬.০ ভূমিকা
৬.১ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারা ও গোরা উপন্যাস
৬.২ উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব ও গোরা উপন্যাস
৬.৩ যুগলবন্ধু চরিত্র—গোরা ও বিনয়
৬.৪ যুগল নায়িকা — সুচরিতা ও ললিতা চরিত্র
৬.৫ অন্যান্য চরিত্র
৬.৬ উপসংহার ঃ গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ
৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী
৬.৮ নির্বাচিত প্রশ্ন

## ৬.০ ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯১০, বইটি তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গিত। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালা (১৯০৯-১১) গীতাঞ্জলি কাব্য (১৯১০), রাজা নাটক (১৯১০) আলোচ্য সময়বৃত্তেই প্রকাশিত। রবীন্দ্রসাহিত্যে যেহেতু একটি অখণ্ড ভাবপ্রবাহ আছে, গোরা উপন্যাসের আলোচনাকালে আলোচ্য প্রবন্ধকাব্য-নাটক ইত্যাদিতে প্রকাশিত ভাব ও ভাবনার সঙ্গে উপন্যাসের আইডিয়া বা মতাদর্শের তুলনা ও প্রতিতুলনা সম্ভব।

মাঘোৎসবের পর রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দিলেন সমারোহ করে গগনেন্দ্রনাথের ভগিনী বিনয়িনী দেবীর বালবিধবা কন্যা প্রতিমার সঙ্গে। "ঠাকুর পরিবারে বা আদি ব্রাহ্মসমাজে এটা একটা বিপ্লব বা বিদ্রোহ; মহর্ষির জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে হয়তো এমন বৈপ্লবিক সংস্কারকার্য সম্ভবপর ছিল না।" এই বিয়ে উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে গোরা উপন্যাসটি উৎসর্গ করলেন। প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লেখা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; সেই উপলক্ষে ১৩১৪ (১৯০৭) সালের ভাদ্র মাস থেকে 'গোরা' উপন্যাস সেখানে লিখতে শুরু করেন, শেষ করেন ১৩১৬ সালের ফাল্গুন (১৯১০) সংখ্যায়—অর্থাৎ আড়াই বছর সময় লাগে।

"প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 'গোরা' উপন্যাস বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা আজকের বাঙালি সমাজের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তার কারণ, গোরার অনেক সমস্যা এখন অদৃশ্য হয়েছে এবং তার স্থানে অন্য অনেক সমস্যা এসেছে। কিন্তু যুগসমস্যার প্রশ্ন বাদ দিলেও 'গোরা'র মধ্যে অনেক শাশ্বত প্রশ্নের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।" (রবীন্দ্রজীবন কথা : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; ১৯৬১)। আজ 'গোরা' উপন্যাস রচনার পর ৯৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, এ উপন্যাসের সাহিত্যিক ও শৈল্পিক সৌন্দর্য এবং প্রকাশিত মানবতাবাদ অম্লান হয়ে রয়েছে।

## ৬.১ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারা ও গোরা উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উপন্যাসে অল্পস্বল্প বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ছিল। তাঁর 'বৌঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩) ও রাজর্ষি (১৮৮৭) ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত ও রোমান্স পর্যায়ভুক্ত। রোমান্স অর্থাৎ যে উপন্যাসে বাস্তবের যুক্তিশৃঙ্খলাকে অনায়াসে লঙ্ঘন করা হয় অর্থাৎ এককথায় কল্পনা যেখানে অনায়াস ডানা মেলে দেয়।

নৌকাডুবি (১৯০৬) পরবর্তী উপন্যাস, এখানেও কল্পনা কার্যকারণকে অতিক্রম করে গেছে। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত 'চোখের বালি' উপন্যাসের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার প্রবর্তন করলেন। এই প্রথম দেখা গেল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যচয়ন। পরবর্তী 'গোরা' উপন্যাসে রয়েছে মহাকাব্যিক আবেদন, বৃহৎ ক্যানভাসে রচিত মানবজীবনের রসরূপ—মনস্তাত্ত্বিক ঘাতপ্রতিঘাতও এখানে বড় কম নেই।

'চতুরঙ্গ' থেকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু—চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), চার অধ্যায় (১৯৩৪) প্রভৃতি উপন্যাসে রয়েছে গীতিধর্ম, সাংকেতিকতা ও আশিকতার লক্ষণ। অর্থাৎ ভাবের মধ্যে এসেছে সাংগীতিক আভাসময়তা, স্বপ্ন ও মনোগহনের অলোড়ন, কাহিনীর মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে বিছিয়ে দেয়া কিছু কিছু ফাঁক। বহিরঙ্গে রয়েছে ভাষার শাণিত প্রখর দীপ্তি। এসবই বিংশশতকীয় উপন্যাসের সার্বিক লক্ষণ বলে গণ্য হতে পারে।

'গোরা' উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ আলোচনা পাই ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামক গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ' নামক অধ্যায়ে। বস্তুত ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটি উৎকর্ষে উপন্যাস নিয়ে লেখা ইয়োরোপ ও আমেরিকার সেরা সমালোচনা গ্রন্থগুলির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। "ইহার মধ্যে অনেকটা মহাকাব্যের বিশালতা ও বিস্তৃতি আছে—'গোরা' উপন্যাস সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের এই মন্তব্যটি অবশ্যই বহুমাত্রিক। তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তব্যের একটি সংকলন করছি। 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ও অনন্যস্থানের অধিকারী। এর প্রসার ও পরিধি সাধারণ উপন্যাসের থেকে অনেক বেশি। এর পাত্র-পাত্রীদের যে কেবল ব্যক্তিগত জীবন আছে তা নয়, আন্দোলন-বিশেষ বা ধর্মগত সংঘর্ষ বিশেষের প্রতিনিধি হিসেবে তাদেরএকটা বৃহত্তর সত্তা আছে। বাংলা দেশের এক বিশিষ্ট যুগসন্ধিক্ষণের সমস্ত বিক্ষোভ আলোড়ন, আমাদের দেশাত্মবোধের প্রথম স্ফুরণের সমস্ত চাঞ্চল্য, আমাদের ধর্মবিপ্লবের সমস্ত একাগ্রতা ও উদ্দীপনা এ উপন্যাসে স্থানলাভ করেছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে ধর্মবিষয়ে সনাতনপন্থী ও নব্যপন্থী, রক্ষণশীল ও সংস্কারক—এই উভয় সম্প্রদায়ের যুক্তিতর্ক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয়গুলি সবিশেষ আলোচিত হয়েছে। তর্কের উদ্দামকোলাহলে তাহাদের জীবনের সূক্ষ্ম রাগিনী ও নিগূঢ় মর্মস্পন্দন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। গোরাকে একটা জীবন্ত মানুষ অপেক্ষা ভারতবর্ষের আত্মবোধের প্রকাশ বলেই বেশি মনে হয়। সমস্ত উপন্যাসের বিরুদ্ধেই অনেকটা এই ধরণের অভিযোগ আনা হয়েছে।

সমালোচকেরা বলেছেন এর চরিত্রচিত্রণ যথেষ্ট গভীর ও ব্যক্তিত্বদ্যোতক নয়, এর চরিত্রগুলি ব্যক্তিত্বউন্মেষ যথেষ্ট উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান নয়। উপন্যাস সম্বন্ধে এইসব অভিযোগের যাথার্থ্য অবশ্যই বিচারযোগ্য। অভিযোগগুলি কিছুটা স্বীকার্য। তর্কবিতর্ক ও মতবাদে কোন চরিত্রের সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ পরিচয়—মানবপরিচয়—প্রায়ই আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অথচ মানুষের পূর্ণাঙ্গ ও গভীর গোপন পরিচয়ের দিকেই উপন্যাসপাঠকের লোভ বেশী। মতবাদপ্রাধান্য যখন চরিত্রের ব্যক্তিপরিচয় ক্ষুণ্ণ করে তখন তার আচার-আচরণ কি রকম ঘটতে চলেছে পূর্বেই অনুমান করা যায়, এতে করে সে চরিত্রের জীবনঘটিত রহস্যময়তা কমে যায়। নমনীয়তা, বিস্ময়, দিকবদল—উপন্যাসের চরিত্রের এইসব বিশেষ গুণগুলি স্বভাবতই থাকতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে পরেশবাবুর উল্লেখ করতে পারি। গোরা উপন্যাসে "পরেশবাবুরও অভ্রান্ত ও অবিচলিত সত্যানুসরণ, তাঁহার ধর্মবুদ্ধির অবিমিশ্র উৎকর্ষ তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রকে অনেকটা নিষ্প্রভ ও বৈচিত্রবিহীন করিয়াছে।" সুতরাং এদিক দিয়ে যে সমস্ত চরিত্র মতবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যায় নি, মতবাদ সমর্থনে দ্বিধা বা দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে অথবা যুক্তিতর্ক আলোচনার মধ্য দিয়ে যাদের জীবনে নিগূঢ় পরিবর্তন এসেছে তারা প্রাণরসে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। "এই হিসাবে দ্বিধাগ্রস্তচিত্ত বিনয়, অভাবনীয় রূপে পরিবর্তিতা সুচরিতা ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহপরায়ণা ললিতা আমাদের নিকট অধিকতর জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হয়।"

উপন্যাসে অবশ্য যুক্তিতর্কের বিদ্যুৎঝলকের ভিতর দিয়েও মানব-অন্তঃকরণকে ছোঁয়া যায়। মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কোন চরিত্রের যুক্তিতর্ক তার হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস ও একেবারে অন্তঃস্থল থেকে উত্থিত হয় তবে সেই চরিত্র অবশ্যই উপন্যাসে মহৎ মানবিক বিভামণ্ডিত হতে পারে। গোরা চরিত্রে এই জাতীয় ছাপ আছে। বস্তুত তার চরিত্রে এক অসাধারণ হৃদয়জ সৌন্দর্য আছে। গোরার তর্ক নিছক বুদ্ধিসর্বস্ব নয়, তা একদিকে তার হৃদয়ের গভীরতম উৎস থেকে উৎসারিত অন্যদিকে উপন্যাসের অপরাপর মানবমানবীর সঙ্গে তার সম্পর্কের রঙ ক্ষণে ক্ষণে বদলে দেয়। তার মাতৃভক্তি, বন্ধুপ্রীতি, এমনকি নিজে কে ততটা স্বীকার না করলেও আদর্শবাদের মোড়কে আবির্ভূত তার প্রণয়পিপাসা এসবই তাকে প্রাণবন্ত ও মহিমান্বিত করেছে। নিজের একমুখী মনোভাব অবশ্য তাকে ওইসব চরিত্রের সঙ্গে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত করেছে। আনন্দময়ীর উদার মাতৃস্নেহ, বিনয়ের বন্ধুবিচ্ছেদের আশঙ্কাজনিত ভাবাবেগ, সুচরিতার প্রেম সমস্তই মিলেমিশে গোরার শুষ্ক মতবাদসর্বস্ব জীবনকে শেষপর্যন্ত জীবন্ত ও অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। সুচরিতাই শেষপর্যন্ত তার জীবনের মহতী রূপান্তর ঘটিয়েছে প্রেমের মায়াপ্রদীপের সংস্পর্শে। সাংসারিকতার সহজ সামাজিক পথে গোরার সঙ্গে সুচরিতার পরিচয় হয় নি, এ পরিচয় গাঢ় হয়েছে দুটি বিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সংঘর্ষের কারণে। বস্তুত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সুচরিতাকে স্বঘোষিত হিন্দুধর্মের ধারকবাহক ও মুক্তিদাতা গোরা আত্মসমর্থনে বজ্রনির্ঘোষে যে বানী শুনিয়েছে তারই ভিতরে প্রচ্ছন্ন হয়েছিল প্রেমের লুকোনো আবির্ভাব। শেষ পর্যন্ত যুক্তিপরম্পরার পরাজয় ঘটেছে, আত্মদমনমূলক সন্ন্যাসের পথ থেকে যোগীশ্বর গোরা প্রেমের সহজ পথে অগ্রসর হয়ে গেছে। তার প্রবল আগ্রহ, তার বলিষ্ঠ প্রকৃতির সম্পূর্ণ শক্তির পিছনে প্রেমের বৈদুর্যশক্তি সুতীব্র গতিসঞ্চার করেছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গীতে যথার্থই বলেছেন—"সুচরিতার সহিত প্রথম পরিচয়ের পর নির্জন গঙ্গাতটে তাহার কঠোর তপস্যারত ভাবমগ্ন চিত্তের এক অসতর্ক ফাঁক দিয়া যে মুগ্ধ প্রণয়াবেশের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাই তাহাকে দেশাত্মবোধের প্রতিনিধিত্ব হইতে অভিঘাত-চঞ্চল, উষ্মরক্ত-সঞ্চরণশীল ব্যক্তিগত জীবনে উন্নীত করিয়াছে। যে মুহূর্তে প্রেম আসিয়া দেশপ্রীতির হাত হইতে রশ্মি কাড়িয়া লইয়াছে, সেই মুহূর্ত হইতে যে গোরার জীবনরথ ব্যক্তিত্বের অসাধারণ পথ বাহিয়া চলিয়াছে সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না।"

যখন কোন উপন্যাসের চরিত্র একটা জাতির সমগ্র আশাআকাঙ্ক্ষা বা কোন ধর্ম বা সভ্যতার বিশেষত্বের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়, তখন তার ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্য এই অসাধারণ প্রসারের ফলে খর্বিত হয়ে পড়ে—এই হ'ল সাধারণ অভিমত। শতকণ্ঠের বাণী যখন একের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তখন তার সেই উক্তির মধ্যে তার নিজস্ব সুর তত থাকে না, এই আশঙ্কা কিছুটা রয়ে যায়। সেইজন্য গোরার জীবন যখন ব্যক্তিগত গন্ডীকে ছাড়িয়ে বহুদূরে সমগ্র দেশের সংস্কৃতি বা ধর্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করে, অথবা দেশকাল নির্বিশেষে এক রহস্যময় অসীমতার দিকে পক্ষবিস্তার করে তখন উপন্যাসের দিক থেকে তার ব্যক্তিত্ব কিঞ্চিৎ ফিকে বোধ হয়; সে রক্তমাংসের মানুষ না হয়ে যেন মতবাদের বাহন হয়ে ওঠে। "গোরা যেখানে নিছক তার্কিকতার প্রশ্রয় দিয়াছে, যেখানে সে ঘোষচরপুরের প্রজাদের প্রতি অত্যাচার নিবারণজন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালোভের জন্য গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া হাঁটিয়াছে, সেখানে জাতীয়তার প্রবল অভিভবে তাহার ব্যক্তিত্ব ক্লিষ্ট, নিস্পেষিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে সে তার্কের সূত্র ধরিয়া আনন্দময়ীকে বেদনা দিয়াছে বা বিনয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য তাহার অন্তঃকরণের তলদেশে নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির আলোকপাত করিয়াছে, সর্বোপরি যেখানে সে সুচরিতার সহিত নিগূঢ় হৃদয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে সেখানে সে প্রতিনিধিত্বের ছায়ামণ্ডলমুক্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আলোকে ভাস্বর পুরুষ।

গোরার জন্মরহস্য গোরাচরিত্র সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। গোরাকে আইরিশখ্যান প্রতিপন্ন করায় লেখকের কি উদ্দেশ্য সে সম্বন্ধেও কৌতূহলপূর্ব প্রশ্ন ওঠে। উত্তরটি একান্ত সহজ। লেখক গোরা চরিত্রকে বন্ধনমুক্ত

করে মুক্ত মানবরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সে সংকীর্ণ ধর্ম থেকে মানবধর্মের পথে, ভ্রান্ত স্বাজাত্যবোধ থেকে উদার বিশ্ববোধমুক্ত দেশপ্রেমের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। গ্রন্থের শেষে গোরার জন্মরহস্যপ্রকাশ অতর্কিত বজ্রপাতের মতই গোরার উপর এসে পড়েছে। এতে তার দেশভক্তির কোন হ্রাস হয় নি, কিন্তু এই দেশভক্তির সংকীর্ণ সাধনপথটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হিন্দুধর্মের যে কঠোর নিয়মসংযম, যে অবিচলিত আচারনিষ্ঠা গোরার জীবনের মহত্তম ব্রত ছিল, এক মুহূর্তেই প্রমাণিত হয়েছে, সে এই ব্রতপালনের অধিকারী নয়। দেশানুরাগ ও ধর্মনিষ্ঠা যে শুষ্ক আচারআচরণরূপে তার বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে ছিল তা নিমেষে অন্তর্হিত হ'ল। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে যে হিন্দুধর্মের সর্বাপেক্ষা ভক্তিমান, একনিষ্ঠ ও গভীর প্রত্যয়ী সাধক ছিল সে অহিন্দু বলে প্রমাণিত হ'ল। ফলে পূর্ব জীবনযাপনের থেকে বিচ্ছেদের বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন জীবনসম্ভাবনার এক বিপুল মুক্তির আনন্দ। গোরার পূর্বজীবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত, তাকে ডাকছে নতুন জীবন। দেশপ্রীতি ও ব্যক্তিগত প্রেমপ্রীতি নতুন অর্থ পেল। আনন্দময়ীর মাতৃস্নেহ, বিনয়ের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা, সুচরিতার প্রেম তাকে ভবিষ্যতের এক সূর্য আলোকিত পথে ধাবিত করে দিল। এখন আর পরিবেশের সঙ্গে ব্যর্থ সংগ্রাম নয়, এখন ঘটল পরিবেশের সঙ্গে অনুকূল মিলন। গোরার এই জীবনরসায়নের রূপান্তর প্রক্রিয়াই চরিত্রটিকে মহৎ এবং আকর্ষনীয় করে তুলেছে।

বিনয় তার দ্বিধাসংকোচপূর্ণ সুকুমার হৃদয় নিয়ে রক্তমাংসের মানুষ। "একদিকে গোরার অনমনীয় মতবাদের প্রতি, অপরদিকে তাহার কোমল সামাজিক স্নেহবন্ধনের প্রতি, উন্মুখ হৃদয়ের বিশ্বস্ততার দাবি—এই দুইএর মধ্যে সতত বিরোধে সে উভয়সংকটে পড়িয়াছে। তাহার যুক্তিতর্কমতবাদ হৃদয়াবেগের নিকট মাথা হেঁট করিয়াছে। গোরার সহিত বাকবিতন্ডায় উপেক্ষিত হৃদয়বৃত্তিরই সে পক্ষ সমর্থন করিয়াছে।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ঃ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। পরেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর যখন বিনয় উচ্ছসিত আবেগময় ভাষায় গোরার কাছে তার হৃদয়ে প্রেমের অপরূপ প্রথম আবির্ভাবের বর্ণনা করেছিল তখন গোরা এই প্রেমআবির্ভাবের সত্যতা স্বীকার করেছিল। কিন্তু সে নিজ আদর্শের বিভিন্নতারও উল্লেখ করেছিল। মনে হয়েছিল গোরা বিনয়কে স্বাধীনভাবে তার নবজাগ্রত দুর্বার গতি প্রেমপথে চলতে দেবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সে বিনয়ের এই নব উন্মেষিত প্রণয়াবেগকে এক তিল স্বাধীনতা দিতেও প্রস্তুত নয়। অতএব দেখা যায় গোরার পরবর্তী ব্যবহার বন্ধুর প্রেমপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণই করা।

বিনয়ের সঙ্গে ললিতার প্রেমের উদ্ভব ও পরিণতি খুব নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। একটা প্রবল বিরুদ্ধতা, এমন কি তীব্র অবজ্ঞাপ্রকাশের ছদ্মবেশে প্রেম কিভাবে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে, প্রেমের সেই চিররহস্যময় প্রকৃতিরই উদঘাটন বিনয়ললিতার সম্পর্কটিকে মনোজ্ঞ করে তুলেছে। প্রথম সাক্ষাতেই ললিতা বিনয়ের প্রতি এক অপূর্ব আকর্ষণ বোধ করেছে, তার উপর নিজের অধিকার জারি করার একটা প্রবল প্রেরণা অনুভব করেছে। তাই সুচরিতার সঙ্গে বিনয়ের প্রণয়সম্ভাবনায় তার মন একটা ক্ষণস্থায়ী তীব্র ঈর্ষাদ্বারা অভিভূত হয়েছে। এ সন্দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে সে গোরার বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিযোগিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। কঠোর আঘাতও নির্মম ব্যঙ্গ দিয়ে সে বিনয়কে গোরার প্রভাব থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে, তাকে গোরার উপগ্রহের পদ থেকে বিচ্যুত করে নিজের কক্ষপথে আবর্তিত করতে প্রয়াস পেয়েছে। বিনয়ের উপর গোরার প্রভাবে যে একটু অস্বাভাবিকত্ব, একটু অনুচিত অতিশয্য আছে, বিনয়ের প্রকৃতিতে যে একটা অবরুদ্ধ বিদ্রোহোন্মুখতা আছে, প্রণয়ের স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্নদর্শিতার সঙ্গে ললিতা প্রথম সাক্ষাতেই তা আবিষ্কার করেছে ও দাড়িপাল্লার অপরদিকে তার প্রভাবের সমস্ত গুরুভার নিক্ষেপ করেছে। তার অবিরাম আকর্ষণে বিনয় অনেকটা বিচলিত হয়েছে ও গোরার মতের বিরুদ্ধে অভিনয়ে বা বিরোধিতার ভাণে যোগ দিতে রাজি হয়েছে। এই অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় ললিতা নিজ ব্যবহারে প্রেমের আকস্মিক ভাবপরিবর্তন ও অস্থির মতিত্বের পূর্ণমাত্রা প্রকাশ করেছে। ষ্টীমার যাত্রাকালে বিনয়ের প্রতি একান্ত নির্ভরেই ললিতার প্রেমের প্রথম অকুণ্ঠিত, অনবগুণ্ঠিত

প্রকাশ। কিন্তু এই অনিবার্য আত্মপরিচয়ের পরেও প্রেমের পথ ঠিক সরল রেখায় অনুবর্তন করে নি। শেষে ব্রাহ্মসমাজের নীচ আক্রমণও কাপুরুষোচিত ইতর ব্যঙ্গবিদ্রূপই এই অপরিণত প্রেমকে পরিণতির পথে এগিয়ে দিল। ললিতার দৃপ্ত তেজস্বিতা তার প্রেমবিকাশে সাহায্য করেছে, তাকে সংকোচহীন ও মুক্তকণ্ঠ করে তুলেছে এবং বিনয়ের ভীরু দ্বিধাদুর্বল চিত্তেও তার উত্তাপ কিছুটা সঞ্চার করে দিয়েছে। তাদের মিলনের পথে যে সমস্ত কৃত্রিম সমাজে ও ধর্মমতমূলক বাধা মাথা তুলেছিল, ললিতার প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি সে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বিবাহ ব্রাহ্মমতে হবে কি হিন্দুমতে হবে—এই আপত্তি প্রায় তিন অধ্যায় ধরে পল্লবিত হয়েছে এবং এই সমস্যার শেষ পর্যন্ত যে সমাধান হয়েছে তা-ও মোটে সন্তোষজনক ও চূড়ান্ত নয়। শেষ পর্যন্ত ললিতার একান্ত ইচ্ছায় স্থির হল যে শালগ্রামশিলা বাদ দিয়ে বিবাহ হিন্দুমতেই হবে, কেন না বিবাহের জন্য ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়া বিনয়ের পক্ষে অপমানজনক হবে। আবার ললিতার পক্ষেও সম্ভব ছিল না হিন্দুসমাজভুক্ত হওয়া। এই সমস্যার আসল মীমাংসা হোত উভয় সম্প্রদায়গত আনুষ্ঠানিক আচারের সম্পূর্ণ বর্জনের দ্বারা। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, গ্রন্থের এই অংশটি তার্কিকতার দ্বারা অযথা ভারাক্রান্ত। তর্কভার অবশ্য সমগ্র গোরা উপন্যাসটিরই এক লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্য। আসলে এক সামাজিক মূঢ়তা ও গোড়ামির ছবি দেখানোতেই গ্রন্থের এসব অংশের উপযোগিতা।

ললিতার সঙ্গে সুচরিতার ভাবগত ঐক্য অথচ চরিত্রগত পার্থক্য খুব চমৎকারভাবে দেখান হয়েছে। ললিতার নির্ভীক বিদ্রোহঘোষণার পাশে সুচরিতার শান্তধীর বিনয়নম্র নূতন জ্ঞানআহরণের জন্য উন্মুখ ভক্তিপূর্ণ শিক্ষার্থীর মত প্রকৃতিটি একটি সুন্দর বৈপরীত্বের হেতু হয়েছে। পরেশবাবুর সঙ্গে তার সম্বন্ধটি ভক্তির সুরভিঅর্ঘে, উদ্বিগ্ন স্নেহব্যাকুলতায়, সর্বোপরি একটি গভীর অধ্যাত্মমিলনে, পিতাপুত্রীর পরস্পর সম্পর্কের আদর্শস্বরূপ হয়েছে অথচ এর মধ্যে আদর্শলোকের ছায়াময় অস্পষ্টতা কোথাও নেই। সুচরিতারমত আত্মসুখে উদাসীন, আত্মবিসর্জন উন্মুখ প্রকৃতি যে হারাণকে প্রত্যাখ্যান করতে উদ্যত হয়েছে তার কারণ কিছুটা পরেশবাবুর প্রতি ভক্তি ও গোরার প্রতি নবজাত অনুরাগ, কিন্তু এই বিচ্ছেদসংঘটনের প্রধান দায়িত্ব হারাণেরই। তার আধ্যাত্মিক অহংকার, তীব্র অসহিষ্ণুতা এবং সহানুভূতি ও কল্পনাশক্তির একান্ত অভাবই সুচরিতার মত মধুর স্বভাবকেও তিক্ত করে তুলেছে। ব্রাহ্মসমাজের মত নিজেদের আধ্যাত্মিক জাগরণ সম্বন্ধে প্রবলভাবে সচেতন, নবউৎসাহের মাদকতায় প্রচন্ডভাবে উগ্র, নবীন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই হারাণের মত চরিত্রের আবির্ভাব সম্ভব। জড়, নিদ্রালস ও গভীর উদাসীনতাপূর্ণ হিন্দুসমাজে সামাজিক অত্যাচারের আকার অন্যরকম। হিন্দুধর্মের অত্যাচার অনেকটা চেতনাহীন মূঢ় যান্ত্রিকতার অত্যাচার; হৃদয়হীন নির্বিকারতাই এর উৎপীড়নের প্রধান অস্ত্র; এর মধ্যে নির্মম ব্যূহরচনা, ক্রুর যুদ্ধকৌশলের বিশেষ প্রকাশ নেই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উৎপীড়নের মধ্যে আধ্যাত্মিক দম্ভের সমস্ত বিষজ্বালা বর্তমান; এর সমস্ত ক্ষুদ্রতা, সমস্ত ঈর্ষাপরায়ণতা, সমস্ত নীচ প্রবৃত্তি আধ্যাত্মিকতার কপটবেশ পরিধান ক'রে, ভগবানের নামকে মিথ্যাভাণে জয়পতাকার মত আস্ফালন ক'রে—এর যারা লক্ষ্যবস্তু তাদের জীবনকে বিষজর্জর করে তোলে। এর নীতি চাণক্যনীতির মত কূটকৌশলময়, নিজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে এর বিশ্বাস আত্মম্ভরিতায় উন্নীত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মধর্মের জোয়ারে আধ্যাত্মিক নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিপরীত লক্ষণও যে দেখা দিয়েছিল, হারাণবাবুর মত চরিত্রই তার প্রমাণ।

"সুচরিতার হৃদয়ে প্রেম নিতান্ত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ম্লান সন্ধ্যালোকের মত অগোচরে আবির্ভূত হইয়াছে। ললিতার মত তাহার তীব্র বিদ্রোহ ও অসহ্য অন্তর্জ্বালা নাই, আছে এক প্রকার শান্ত, মৃদু বিষণ্ণ বিস্ময়। গোরার উপেক্ষাতে একটা অনির্দেশ্য বেদনাবোধই তাহার প্রেমের প্রথম সূচনা। তারপর গোরার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি, তাহার প্রবল আবেদন, তাহার স্বদেশপ্রীতির উচ্ছসিত আন্তরিকতা, সুচরিতার সমস্ত বদ্ধমূল পূর্ব সংস্কারকে সবলে উন্মূলিত করিয়া দুর্নিবার বেগে তাহাকে গোরার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে।" গোরার আকর্ষণী শক্তি এতটাই অলঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে যে তার

আজন্মলালিত পরেশবাবুর প্রভাবও এর দ্বারা ম্লান হয়ে গিয়েছে। তার একনিষ্ঠ ভক্তিপ্রবণ মনে ধর্মবিপ্লবের আঘাতের গভীরতা খুব নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক আঘাতেই সে পরেশবাবুর আদর্শ ও শিক্ষাকে আরও ব্যাকুলভাবে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে; পুরাতনের সঙ্গে দুর্জয় নবউপলব্ধির একটা সমন্বয় করতে চেয়েছে। প্রেমের গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে গোরার নূতন আদর্শ তার অন্তরের গভীরতম অঞ্চলে প্রবেশ করে সেখানকার বদ্ধমূল ধর্মসংস্কারগুলিকে যেন বিস্ফোরক তেজে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত সুচরিতা সমস্ত বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে নিজেকে হিন্দু নামে পরিচিত করেছে। হরিমোহিনীর সমস্ত মূঢ় বিরুদ্ধাচরণ তাকে অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ পীড়িত করেছে কিন্তু তার স্বাভাবিক নম্র ও আদেশপালন তৎপর প্রকৃতিটিকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে উত্তেজিত করতে পারেনি। শেষে এক মুহূর্তে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে। গোরার জন্ম রহস্যপ্রকাশ সুচরিতাকে দ্বন্দ্বহীন করেছে, গোরাকে সুচরিতার পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, ওই নারীর ধর্মসংস্কারে কোন অস্থির ঢেউ না তুলেই। সুচরিতার আত্মজিজ্ঞাসাশীল হৃদয় অতীতের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ স্বীকার না করেই তার সমাগত প্রেমের নবীন আদর্শকে এক বৃহৎ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বরণ করে নিয়েছে। সুচরিতার প্রেমই যেন তার সুতীব্র আকর্ষণের তেজে গোরার অন্তর্নিহিত সত্তাকে বহিঃ-সংস্কারের কঠিন আবরণ থেকে মুক্তি দিয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে তাকে একাত্ম করে নিয়েছে। তাদের পরিণয় দুটি দীপ্ত মানবাত্মার একান্ত মিলন।

সুচরিতার চরিত্রের বিশেষত্বই এই যে, আধ্যাত্মিক আত্মজিজ্ঞাসার পথ দিয়েই এর পূর্ণবিকাশ। তার সমস্ত যুক্তিতর্ক, তার সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের অস্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়েই তার ব্যক্তিত্ব ক্রমে উজ্জ্বল দীপশিখার মত ভাস্বর হয়েছে। সাংসারিক কর্তব্যের চাপে এ প্রকৃতি ফুটত না, উচ্চকণ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষণায় এ স্বাধীনতা পেত না, প্রেমের নিরঙ্কুশ অধিকারের দোহাই দিয়ে এর সার্থকতালাভ হোত না। "তর্কমূলক বিশ্লেষণ দ্বারা গভীর জীবনরহস্য ধরা যায় না—এই সাধারণ বিশ্বাস সুচরিতার চরিত্রের দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে।"

হরিমোহিনীর চরিত্রের মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। গ্রন্থের প্রথমাংশ সে একজন খাঁটি হিন্দু ঘরের বিধবা—তেমনি কুণ্ঠিত, তেমনি পরমুখাপেক্ষী, তেমনি সর্বংসহা। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তার অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সুচরিতার উপর নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তার দৃঢ় সংকল্প ও নূতন নূতন উপায়উদ্ভাবন কৌশল বাস্তবিকই বিস্ময়কর। সুচরিতার শান্ত নম্র প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখা সহজ কিন্তু গোরার সঙ্গে সংঘাতেও সে লিপ্ত হয়েছে এবং গোরার মত অনমনীয় ব্যক্তিত্বকেও সে সংকোচের দ্বিধাভাব ও পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করিয়েছে। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। হরিমোহিনীর পূর্বজীবনের ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে তার দেবরেরা ফাঁকি দিয়ে তার সম্পত্তি অধিকার করেছিল, কিন্তু সুচরিতার উপর আধিপত্য বিস্তারে সে যথেষ্ট বৈষয়িক বুদ্ধি ও কূট চালের পরিচয় দিয়েছে।

আনন্দময়ী ও পরেশবাবুকে আদর্শস্থানীয় চরিত্র বলা যায়। এই ধরণের চরিত্রকে কিছুটা রক্তমাংসহীন ও অবাস্তব বলে মনে হতে পারে। আনন্দময়ী ও পরেশবাবুর মধ্যে তবু আনন্দময়ী চরিত্রটিকে আমরা কিছুটা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর পূর্ব ইতিহাস তাঁর চরিত্রের উপর অনেকটা সন্তোষজনক আলোকপাত করে। তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব—সর্বপ্রকার আচারবিচারগত সংস্কার নিরপেক্ষতা, সর্ববিধ সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি, স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি,পরকে আপন করার ও সমস্ত বিষয়ের ভাল দিক লক্ষ্য করবার অসামান্য ক্ষমতা, নীরব অভিযোগহীন সহিষ্ণুতা ও করুণ সমবেদনা—গোরাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করা থেকেই উদ্ভূত। আনন্দময়ীর ব্যবহার ও কথাবার্তায় যে গভীর অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে কোন পাণ্ডিত্য বা তার্কিকতার কাঠিন্য নেই, কোন অধীত বিদ্যার উগ্র গন্ধ নেই, তাঁর ব্যক্তিত্ব নিতান্ত স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক, দয়ামায়া ও সহানুভূতিতে উজ্জ্বল। বিনয় ও গোরার প্রত্যেক ভাব-পরিবর্তন, মনোজগতের প্রত্যেক তরঙ্গলীলা তাঁর নখদর্পণে—একপ্রকার সহজ সংস্কারের বলে যেন তিনি

তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখেছেন। যেখানে তাদের আচরণ অনুচিত বলে তাঁর মনে হয়েছে, সেখানেও উচ্চমঞ্চ থেকে উপদেশের আড়ম্বর নেই, আছে সস্নেহ অনুনয়। আনন্দময়ীর চরিত্রের খুব বিস্তৃত বিশ্লেষণ না থাকলেও তার আশ্চর্য উদারতা ও অনাবিল করুণার্দ্র বিচারবুদ্ধি কোন মূল উৎস হতে প্রবাহিত তার একটা সাধারণ ধারণা আমরা করতে পারি। আনন্দময়ী নিজের পূর্বইতিহাস বিবৃতি প্রসঙ্গে একস্থানে বলেছেন, তাঁর স্বামীর চাকরির সময় তাঁর পূর্ব সংস্কারগুলিকে একটি একটি করে সবলে উৎপাটিত করা হয়েছে এবং তাই তাঁর সংস্কারমুক্তির কারণ। কিন্তু পাঠক গভীরভাবে ভেবে দেখলে বুঝতে পারে এই রমনীর সংস্কারমুক্তি এসেছে যেদিন তিনি জন্মমুহূর্তে শিশু গোরাকে মা রূপে কোলে তুলে নিয়েছেন, নিজে নিঃসন্তান হিন্দুনারী হয়েও আইরিশম্যানের সন্তানকে একই সাথে আত্মশিশু ও বিশ্বশিশুরূপে বুকে ধারণ করেছেন, সেদিন থেকেই এক অতর্কিত ভাব বিপ্লবের পথ ধরে।

পরেশবাবু চরিত্রটি আদর্শবাদপুষ্ট; তাঁর আধ্যাত্মিক পরিণতির পূর্ব ইতিহাস লেখক দেখান নি। তাঁর উক্তিগুলির মধ্যে পাণ্ডিত্যের গুরুভার বা অপরকে নিয়ন্ত্রণ করার অহঙ্কার তত নেই, বরং রয়েছে এক গভীর অনুভূতি। কিন্তু তবু আনন্দময়ীর মত তাঁর জ্ঞান একেবারে সহজ বোধ ও সস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; এ যুক্তিতর্ক ও কঠোর তত্ত্ব-অন্বেষণ-নির্ভর। অতএব আনন্দময়ী চরিত্রের স্বাভাবিকতা এতে নেই। তাঁর অতীত জীবন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু জানা যায় না। বরদাসুন্দরীর মত সংকীর্ণমনা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন রমনীর সঙ্গে কিভাবে তাঁর বিয়ে হ'ল, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কিভাবে তিনি নিজেকে একদিন মিশিয়েছিলেন, যে বিরোধের ফলে তিনি সমাজ ও পরিবার ত্যাগ করে নিজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন—সে সব পূর্ব ইতিহাস লেখক দেন নি। আবার পরেশবাবুর আধ্যাত্মিক প্রভাব কিছুটা তত্ত্বমূলক, ততটা কর্মমূলকনয়, এ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ধ্যানে পরিস্ফুট কিন্তু সংসারের বাস্তবপথে অন্যকে পরিচালনার ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন। তাঁর পরিবারের মধ্যে একমাত্র সুচরিতাও ললিতাকেই তিনি প্রভাবিত করেছেন, এমনকি ললিতার উপরও তাঁর প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয় নয়। মোট কথা পরেশবাবু আমাদের কাছে খুব একটা জীবন্ত চরিত্র বলে প্রতিভাত হন না, তাঁর চরিত্রের সঙ্গে তাঁর উক্তিগুলির খুব একটা ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সাধন হয় নি। বস্তুত এ চরিত্রে রয়েছে মহাপুরুষ-জনিত এক অসাধারণত্ব ও দুজ্ঞেয়তার ছাপ।

অন্যান্য গৌণচরিত্রের মধ্যে মহিমই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদর্শবাদ ও তত্ত্ব নয় এই চরিত্র বাস্তবতা ও সুবিধাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। গোরা ও বিনয়ের আশৈশব বন্ধুত্বের মূলধন ভাঙিয়ে সে নিজের মেয়ের বিয়ের জন্য বর কিনতে উৎসুক। গোরার হিন্দুধর্মে আত্যন্তিক নিষ্ঠা, বিনয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রসূত উদারতা, পিতা কৃষ্ণদয়ালের যোগাভ্যাস ও গুরুভক্তি সমস্তকেই সে তার স্বার্থের আলোকে অভ্যর্থনা করে থাকে। সকল ধর্মমতের তলায় যে পঙ্কিলতা তার সংকীর্ণ মনে তাই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব তার নেই, ভণ্ডামি তার কাছে প্রতারণা নয় বরং জীবনধারণে প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। সে একালীন বণিকধর্মী মানুষ, গোরার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে নিজের সাংসারিক সুবিধার তুচ্ছ প্রয়োজনে লাগাতে চেয়েছে। শেষপর্যন্ত তার নির্বাচিত জামাতা অবিনাশের সঙ্গে পাঠক তার মিল খুঁজে পেয়েছে, অবিনাশের বাইরের ভাবমুগ্ধতার ভিতরে—সে গোরার ভক্তশিষ্য—রয়েছে এক কঠিন বাস্তবতা ও স্বার্থবোধ। সনাতন হিন্দুধর্মের জয়গানেই সে আগাগোড়া ব্যস্ত। "উচ্চ আদর্শের বাদপ্রতিবাদ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সূক্ষ্ম মতদ্বৈধের মধ্যে, মহিমের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সাংসারিক বুদ্ধি, সরস বাকচাতুর্য ও অকুণ্ঠিত সুবিধাবাদের প্রতি আনুগত্য বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।"

"কেবল তত্ত্বালোচনার দিক হইতে গ্রন্থটির স্থান খুব উচ্চে। ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মতদ্বৈধের বিষয়গুলি ইহাতে নিঃশেষভাবে ও গভীর চিন্তাশীলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।) তবে হিন্দুধর্মের অনুকূল যুক্তিগুলিই লেখকের সমধিক সহানুভূতিও সমর্থন কৌশল আকর্ষণ করেছে। এর গৌরবময় অতীত ইতিহাস, এর অধুনাবিকৃত উচ্চ আদর্শ, জাতিভেদ ও মূর্তিপূজার পিছনে যে সূক্ষ্ম

ন্যায়বিচার, উচ্চাঙ্গের কল্পনাবৃত্তির আভাস পাওয়া যায়, আত্মরক্ষা ও নিজ উচ্চতর কল্যাণের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণে সমাজের যে নিগূঢ় অধিকার—হিন্দুধর্মের এই সমস্ত বিশেষত্ব—যা বিদেশীর চোখে এত হাসাস্পদ ও যুক্তিহীন বলে মনে হয়—লেখক আশ্চর্য সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। দেশপ্রীতি ও গভীর ভাবপ্রবণতার অঞ্জন চোখে মেখে হিন্দুধর্মের বিকারগুলিকেও রমণীয় করে দেখিয়েছেন। এরসঙ্গে তুলনায় ব্রাহ্মধর্মের সপক্ষতামূলক উক্তিগুলি নিতান্ত সাধারণ ও প্রাণহীন মনে হয়। হারাণবাবু বা বরদাসুন্দরী কেউই ব্রাহ্মসমাজের উপযুক্ত সমর্থক বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নয়। পরেশবাবু কোন সম্প্রদায় বিশেষের মুখপাত্র নন—তার উদারতা ও আধ্যাত্মিক পরিণতির জন্য কৃতিত্ব ব্রাহ্মসমাজ দাবী করতে পারে না। যে জ্বলন্ত উৎসাহ ও সর্বত্যাগী ধর্মপ্রেরণা ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তকদের শত অসুবিধা তুচ্ছ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল, গোরাতে তার প্রতি কোন সুবিচার চেষ্টা দেখা যায় না। লেখকের যুক্তিতর্ক নূতন ধর্মের দিকে ঝুঁকেছে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর সমস্ত কবিকল্পনা, সমস্ত গভীর সমবেদনা, সমস্ত পরিতাপতীব্র ও খেদজনিত আবেগ হিন্দুধর্ম নামে অভিহিত যে অতীত গৌরবের লুপ্তপ্রায় ভগ্নবিশেষ—তার দিকে অনিবার্য বেগে আকৃষ্ট হয়েছে।

## ৬.২ উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব ও গোরা উপন্যাস

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"য় প্রকাশিত গোরা উপন্যাসের সমালোচনার প্রতিরূপ লিপিবদ্ধ করলাম। অতঃপর উপন্যাসের শিল্পতত্ত্বের নিরিখে গোরা উপন্যাসের কিঞ্চিৎ পর্যালোচনায় এগোচ্ছি। উপন্যাস শিল্প হিসেবে গোরা একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পকর্ম এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। E. M. Forster -এর Aspects of the Novel, Percy Lubbock এর The Craft of Fiction ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব তথা নির্মাণ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। উপন্যাস গল্প বলে—'oh dear yes, the novel tells a story' এই ফর্স্টার বাণী সুপরিচিত, মূলকথা এই গল্পকে উপন্যাসে আকার দেয়ার জন্য লেখককে বিশেষ শিল্পরীতির ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

গোরার মত উপন্যাসের বিশ্লেষণ করতে হলে কয়েকটি বিষয়ের দিকে নজর দিতে হয়—যথাক্রমে—(১) Structural Problems—Unity and coherence, Plot and story; The Time Factor; — গঠনগত সমস্যাবলী — ঐক্য ও সংলগ্নতা, প্লট ও কাহিনী; সময়পট। (২) Narrative Technique গল্পকথন পদ্ধতি। (৩) Characterization চরিত্ররূপায়ণ। (৪) Dialogue সংলাপ। (৫) Background পটভূমি। (৬) স্টাইল বা ভঙ্গিমা। এখন উপন্যাসটির পাঠবিশ্লেষণের সাহায্যে একে একে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে।

প্রথমেই আলোচিতব্য গোরা উপন্যাসের ঐক্য ও সংলগ্নতা, প্লট ও কাহিনী এবং সময়পটসক্রান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ। উপন্যাসের ঐক্য ও সংলগ্নতার ক্ষেত্রে W.H.Hudson তার "An Introduction To The study of Literature" গ্রন্থের "The Study of Fiction" অধ্যায়ে উপন্যাসের দু' ধরণের প্লট লক্ষ্য করেছেন। "These are what we may call respectively the novel of loose plot and the novel of organic plot"—এক ধরণের প্লটকে শিথিলবিন্যস্ত প্লট বলা যেতে পারে; আর একধরণের প্লট হচ্ছে একমুখী প্লট। প্রথম ক্ষেত্রে মূলকাহিনীর মধ্যে একাধিক উপকাহিনী থাকে অথবা অজস্র ঘটনা থাকে যারা পরস্পর খুব একটা ন্যায়সঙ্গতভাবে যুক্ত থাকে না। একজন ব্যক্তি বা নায়কের জীবনে যে বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটে তারই শিথিল বিন্যস্ত সমাহারপুঞ্জ এখানে। উদাহরণ হিসেবে ডিকেন্সের "পিকউইক পেপার্স" বা থ্যাকারের "ভ্যানিটি ফেয়ার" উপন্যাসের নাম করা যায়। অন্যদিকে সংহত প্লটের উপন্যাসে প্লট বা কাহিনীর একটা স্পষ্ট ছাঁচ থাকে যা সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত, ঘটনাগত উপাদানের সুলগ্নতাযুক্ত। গোরা মাঝারি অবয়বের উপন্যাস—রবীন্দ্ররচনাবলীতে (সপ্তম খণ্ড : পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৫) তিনশো পাতা স্থান অধিকার

করেছে। এই উপন্যাসের ঘটনাবলী মোটামুটিভাবে গোরা-বিনয়কে ঘিরে আবর্তিত কিন্তু পাশাপাশি আরো নানা চরিত্র ও সংঘটন আছে। একে আমরা প্লটের দিক থেকে মধ্যবর্তী স্থানে রাখতে পারি অর্থাৎ কিছুটা loose plot ও কিছুটা Organic plot এর মিশ্র অবয়ব এখানে।

E. M. Forster তার Aspects of the Novel এ প্লটের সংজ্ঞা দিয়েছেন—"A plot is also narrative of events, the emphasis falling on causality"—প্লট কাহিনী বা ঘটনা বর্ণনা করে কিন্তু জোর দেয় ঘটনার কার্যকারণশৃঙ্খলা অর্থাৎ বাস্তবতার উপর। বাইরে যা নিছক গল্প, উপন্যাসে সন্নিবেশিত হলে তাই হয়ে ওঠে প্লট—সেখানে লেখককে পদে পদে বাস্তবতার দাবী মেনে চলতে হয়, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে হয়, ঘটনার কার্যকারণসূত্র স্পষ্ট করে দেখাতে হয়। আমরা দেখি গোরা উপন্যাসে বাস্তবতার দাবী গুরুত্ব পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথই যে বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত রোমান্স বা কল্পনা ও আকস্মিকতা নিয়ন্ত্রিত কাহিনীর পরিবর্তে বাস্তবতা বা যুক্তি বিশ্লেষণ সমন্বিত কাহিনীর প্রচলন করলেন তা এখানে স্পষ্ট বোঝা যায়। এজন্যই বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে বাংলা উপন্যাসে প্রথম আধুনিকতার শুরু হয়েছে। গোরা উপন্যাসের শুরুটা হয়েছে কল্পনাসমৃদ্ধ, কাব্যিক বা রোমান্টিকভাবে—"শ্রাবণমাসের সন্ধ্যাবেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে কলেজে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ-করকারির চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনান জ্বালাইবার ধোঁয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তবু এত বড়ো এই যে কাজের শহর কঠিনহৃদয় কলকাতা, ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোনার আলোকের দ্বারা আজ যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।" কিন্তু এই রোমান্টিক উচ্ছাসের হাত এসে ধরল অবিলম্বে বাস্তবের অনুপুঙ্খ বর্ণনা—"ঘরের একপাশে টেবিলের উপরে একটা আয়না, তেলের শিশি ও চুল আঁচড়াইবার সরঞ্জাম ছিল। বিনয় সেই মেয়েটির পিছনে দাঁড়াইয়া সেই আয়নার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।" এখানে বিনয়ের সঙ্গে সুচরিতার প্রথম সাক্ষাৎ বর্ণিত এবং উপন্যাসটির প্লট যে realism-naturalism অর্থাৎ আধুনিক বাস্তবতার দিকে ধাবিত হবে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

সময়পটের ব্যাপারে বলা যায় গোরা উপন্যাসে ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ উপস্থাপিত, ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ এবং হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের সংঘাতসমন্বয়ের দিকটিও এখানে আলোচিত। সে সম্বন্ধে পরে বলছি।

গোরা উপন্যাসের চরিত্রায়ন বা Character প্রসঙ্গ নিয়ে অতঃপর কিছু বলা যাক। এ উপন্যাসে চরিত্রের বর্ণউজ্জ্বল বিচিত্র সমারোহ রয়েছে। গোরা এবং বিনয় চরিত্রই সর্বাধিক কৌতূহলের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গত দিয়েছে সুচরিতা ও ললিতা চরিত্র। উপন্যাসের নায়কনায়িকা সম্পর্কিত তত্ত্ব বা প্রসঙ্গ এখানেই নিহিত। গোরা অবশ্যই এ উপন্যাসের নায়ক, তার নামেই উপন্যাসের নামকরণ; বিনয় গোরা চরিত্রের আড়ালে কিছুটা চাপা পড়েছে কিন্তু এ আড়াল ভেঙে বাইরে আসার বিদ্রোহ বিনয় চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধিকন্তু তার মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম ভাবুকতা। এই ধরণের যুগল বন্ধু চরিত্র যারা অত্যাগসহন অথচ স্বভাবে বিপরীত রবীন্দ্রসাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য। আমরা গোরাবিনয় ছাড়া শচীশ-শ্রীবিলাস, নিখিলেশ-সন্দীপ, সুপ্রিয়-ক্ষেমংকর প্রভৃতি নামউচ্চারণ করতে পারি। গোরা চরিত্রের দৃপ্ত তেজ ও বিনয় চরিত্রের অনুভূতিসূক্ষ্মতা দুই-ই রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্বের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। গোরা এবং সনাতন হিন্দুধর্ম এই দুই এর চাপে পড়ে দ্বন্দ্বময় বিনয়ের আন্তর বিদ্রোহ এই চরিত্রকে আকর্ষনীয় করেছে—"বিনয় পদে পদে তাহাদের দলের ভারতবর্ষের অনেক নিষেধ মানিয়াছে। অনেক সময় দ্বিধা বোধ করিয়াছে, তবু মানিয়াছে। আজ তাহার মনের ভিতরে একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ভারতবর্ষ যেন কেবল নিষেধেরই মূর্তি।" অল্প কথায় অনেক কিছুই বলা হয়েছে। গোরা চরিত্রের তেজোময় হিন্দুত্বও লেখক মুন্সিয়ানার সঙ্গে দেখিয়েছেন, বস্তুত এ ব্যাপারটির উপরই উপন্যাসের মূল প্রবাহ অনেকটা নির্ভর করছে। পাঠক দশম অধ্যায়ের শুরুতেই গোরার আগমন

বর্ণনা লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন—"গোরার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, পরণে মোটা ধুতির উপর ফিতাবাধা জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড়তোলা কটকি জুতো। কে যেন বর্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল।"

সুচরিতা ও ললিতা এই যুগল নারীচরিত্র অঙ্কনে উপন্যাসিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুচরিতা শান্ত ও আত্মসমর্পণময়, ভাবপ্রাধান্যমূলক; ললিতা তর্কপটু, বিদ্রোহিনী, বুদ্ধিদীপ্ত; এই দু'টি চরিত্র পরস্পরের পরিপূরক। সুচরিতার হৃদয়ে গোরার প্রতি প্রেমআবির্ভাবের বর্ণনা প্রথমে আভাসেইঙ্গিতে ও পরে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত। সুচরিতার অন্তর্মুখি ব্যক্তিত্বের চারদিকে একটা রহস্য ও সৌন্দর্যের ছায়া অবশ্যই আছে। নিদ্রাহারা রাতে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের শুরুতে নায়িকার যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে প্রেমের মনস্তত্ব যথেষ্টই প্রকাশিত—"ঘুরিয়া ফিরিয়া আজ সন্ধ্যাবেলাকার সমস্ত ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া তাহার মনে উদয় হইল। সেই সূর্যাস্তরঞ্জিত গাড়িবারান্দার উপর গোরার উদ্দীপ্ত মুখ স্পষ্ট ছবির মতো তাহার স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল এবং তখন তর্কের যে সমস্ত কথা কানে শুনিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল কে সমস্তই গোরার গভীর প্রবল কণ্ঠস্বরে জড়িত হইয়া আগাগোড়া তাহার মনে পড়িল।" ললিতাকে বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ, এ উপন্যাসে তাকে বিনয়ের প্রণয়িনীরূপে দেখতেই আমরা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ি।" এই নিষিদ্ধ ব্যাপারে বিনয়ও তাহার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়াতে সে একদিকে সংকোচ এবং অন্য দিকে একটা নিগূঢ় হর্ষ অনুভব করিতেছিল। এই হর্ষ যেন নিষেধের সংঘাত দ্বারাই বেশি করিয়া আশ্রয় করিয়াছে, তাহার এত কাছে আসিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে আত্মীয় সমাজের কোনো আড়াল নাই, ইহাতে কতখানি কুণ্ঠার কারণ ছিল—কিন্তু বিনয়ের স্বাভাবিক ভদ্রতা এমনি সংযমের সহিত একটি আব্রু রচনা করিয়া রাখিয়াছিল যে এই আশঙ্কাজনক অবস্তার মাঝখানে বিনয়ের সুকুমার শীলতার পরিচয় ললিতাকে ভারি একটা আনন্দ দান করিতেছিল।" স্টীমার যাত্রাকালীন ললিতার এই হৃদয়ভাবনা বিনয়ের প্রতি তার প্রেমানুরাগকেই ব্যক্ত করছে।

গোরা উপন্যাসের চরিত্রায়ন সম্বন্ধে আরো দু'একটি কথা বলা যায়। আনন্দময়ী চরিত্রের ভিতর দিয়ে মানবধর্মের প্রকাশ; পরেশবাবুর চরিত্রেও একই মানবতাবাদ প্রকাশিত। হারাণ বা পানুবাবুর ভিতর গোরার প্রতিস্পর্ধী একটি চরিত্রের অবতারণা, একে ঘিরে কিঞ্চিৎ হাস্যরসের অবতারণাও হয়েছে। কৃষ্ণদয়ালবাবু অর্থাৎ গোরার পিতার তন্ত্রমন্ত্রে আসক্তিও কৌতুকের আবহ সৃষ্টি করেছে। আনন্দময়ী গোরাকে যথার্থ পুত্ররূপেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কৃষ্ণদয়াল প্রথমে তাকে পুত্র হিসেবে খুব একটা স্বীকার করেননি, পরে তাঁর হিন্দুয়ানী যত বাড়াবাড়ি চেহারা নিয়েছে বিজাতীয় গোরার স্পর্শ তত সাবধানে তিনি এড়িয়ে যেতেন। গোরার প্রকৃত পরিচয়ও স্বয়ং তিনিই তাকে প্রদান করেছিলেন, ভেবেছিলেন এভাবেই গোরাকে উন্মার্গগামী ভুল ধর্মচেতনার হাত থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু গোরা জীবনে আত্মস্থ হয়েছে সুচরিতার ভালোবাসার বন্ধনে বন্দী হয়ে। অতএব গোরা উপন্যাসের পরিণতি তত্ত্ব ও ধর্মবিতর্ক ছেড়ে শেষপর্যন্ত মানবজীবনের বিকাশই দেখিয়েছে এবং এ ভাবেই পেয়েছে এক নিজস্ব শৈল্পিক মাত্রা।

এছাড়া গোরা উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব বিচার করতে গেলে—উপন্যাস হিসেবে তার শৈল্পিক সার্থকতা দেখতে গেলে এর সংলাপ, পটভূমি, স্টাইল ও সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে প্রকাশিত লেখকের জীবনদর্শনও বিচার্য। সংলাপরচনার নৈপুণ্যের উপর ঔপন্যাসিকের উৎকর্ষ অনেকটাই নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসসাহিত্যে সংলাপরচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সংলাপ কোনো চরিত্রের মুখে হয়ে ওঠেছে অনুভূতিপ্রধান ও ভাবময়, আবেগগর্ভ; আবার কোনো চরিত্রের মুখে হয়ে উঠেছে বুদ্ধিদীপ্ত, চাতুর্যময়, তীক্ষ্ণপ্রখর। তর্কবিতর্ক এ উপন্যাসে পাতার পর পাতা জুড়ে আছে—মূলত এ বিতর্ক হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে, যদিও অন্যভাবে দেখলে একে বিপরীত প্রকৃতির দ্বৈরথই বলা যায়। উপন্যাসের পাতার পর পাতা জুড়ে অনুরূপ তর্ক আমরা বিশ্বসাহিত্যে অলডাস হাক্সলির 'Point Counterpoint', টমাসমানের 'Magic Mountain',· অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছয়খন্ড "সত্যাসত্য" প্রভৃতি বই-এ

দেখেছি। "সুচরিতা কহিল, 'আপনার বন্ধুর মনে বোধ হয় সংস্কারগুলো খুব দৃঢ়।"

বিনয়। বাইরে থেকে দেখে হঠাৎ তাই মনে হয়। কিন্তু একটা কথা আপনি মনে রাখবেন আমাদের দেশের সংস্কারগুলোকে তিনি যে চেপে ধরে থাকেন, তার কারণ এ নয় যে, সেই সংস্কারগুলিকেই তিনি শ্রেয় মনে করেন।" অথবা "গোরা.....কহিল, 'ভাই বিনয়, আমরা মরব, এক মরণে মরব। আমরা দুজনে এক, আমাদের কেউ বিচ্ছিন্ন করবে না, কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

"কিন্তু বিনয় কহিল, 'ভাই গোরা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি আমাকে কোনোদিন তুমি দ্বিধা করতে দিয়ো না।" লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই সংলাপ হালকা ও ঝকঝকে, কথ্য বাগভঙ্গীর চমৎকার ব্যবহার এখানে।

গোরা, বিনয়, সুচরিতা, ললিতার সংলাপ কখনো কখনো হয়ে উঠেছে কাব্যিক—সূক্ষ্ম অনুভূতিপূর্ণ, ভাবাবেগময়। একটু উদাহরণ দিচ্ছি—গোরার সংলাপ থেকে—"গোরা কহিল, 'ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখছি পাচ্ছি সে তো সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়—সেখানে দুঃর্ভিক্ষ দারিদ্র, সেখানে কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে ফুল দিয়ে পূজো নয়; সেখানে প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে পূজো করতে হবে....."। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসে সংলাপ ব্যবহারে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন,তিনি অসাধারণ শব্দবিদ বলেই এই ব্যাপার ঘটেছে, গদ্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অধিকার বড় একটা কম ছিল না।

উপন্যাসের আর একটি উপাদান background বা স্থানকালগত পটভূমি। গোবার সময়কালকে ঊনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশশতকের শুরুতে স্থাপন করতে পারি। তখন বঙ্গদেশে ঊনিশ শতকীয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অভিঘাত, হিন্দুধর্ম ও হিন্দু ধর্ম থেকে উদিত ব্রাহ্মধর্মের পাশাপাশি অবস্থান এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষে স্বদেশচেতনার ঢেউ পটভূমিকে উদ্বেল করে রেখেছিল। এইসব ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রে কলকাতা অবশ্যই ছিল এবং গোরা উপন্যাসের স্থানপটভূমি হচ্ছেএই শহর কলকাতা—ইংরেজ বনিকের বাণিজ্যরাজধানীরূপে যা ক্রমশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

উপন্যাসের style বা ভঙ্গী নামক উপাদান নিয়েও কিছু বলছি। উপন্যাসে থাকবে অনুভূতির প্রকৃত কণ্ঠস্বর। তা হবে আত্মসচেতন, স্বচ্ছ ও সরল। এখানে রয়েছে বাক্যনির্মাণনৈপুণ্য ও শব্দগুচ্ছবয়নের কৌশল। সৌন্দর্যবোধই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। Form বা আঙ্গিক হয়ে উঠবে শিল্পময়। গোরা উপন্যাসে রয়েছে Realism ও Naturalism বাস্তববাদের কল্পনামিশ্রিত ভঙ্গিমা। শব্দের শক্তিশালী প্রয়োগ, উপস্থাপনার মুন্সিয়ানা বা কলাকৌশল, শৈল্পিক কর্মের সাধননৈপুণ্য, পরিচিত শব্দাবলী নিয়ে এক সতেজ নতুন জগৎ নির্মাণ বা অক্ষরভুবনের প্রতিষ্ঠা, আবেগআলোড়িত চিন্তাবস্তুর পরিবেশন, স্বতোস্ফূর্ত ও নানন্দিক রহস্যময়তা গোরা উপন্যাসে প্রাচুর্যপূর্ণভাবেই রয়েছে। বস্তুত এ সবের মিলিত যোগফলই হচ্ছে গোরা উপন্যাসের স্টাইল। এই স্টাইলকে বোঝাবার জন্য আমি গোরা উপন্যাসের ১৫তম অধ্যায়ের শুরু থেকে অনুচ্ছেদ উদ্ধার করছি—"রাত্রে গোরা বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া অন্ধকার ছাতের উপর বেড়াইতে লাগিল।

তাহার নিজের উপর রাগ হইল। রবিবারটা কেন সে এখন বৃথা কাটিতে দিল। ব্যক্তিবিশেষের প্রণয় লইয়া অন্যসমস্ত কাজ নষ্ট করিবার জন্য তো গোরা পৃথিবীতে আসে নাই। বিনয় যে পথে যাইতেছে সে পথ হইতে তাহাকে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে কেবলই শরীর নষ্ট এবং নিজের মনকে পীড়িত করা হইবে। অতএব জীবনের যাত্রাপথে এখন হইতে বিনয়কে বাদ দিতে হইবে। জীবনে গোরার একটি মাত্র বন্ধু আছে তাহাকেই ত্যাগ করিয়া গোরা তাহার ধর্মকে সত্য করিয়া তুলিবে। এই বলিয়া গোরা হাত নাড়িয়া বিনয়ের সংস্রবকে নিজের চারদিক হইতে যেন সরাইয়া

ফেলিল।" রবীন্দ্রীয় উপন্যাসিক স্টাইলের পরিচয় এখানে ভাষা, আবেগ, চিন্তা, মনন সবকিছুরই এক সম্মিলিত দীপ্তির সমাহার এই উদ্ধৃতি——সমগ্রত গোরা উপন্যাসে এ ভাবেই এক মৌলিক শিল্পরীতি গড়ে উঠেছে।

প্লট-চরিত্র-সংলাপ-পটভূমি প্রভৃতি উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদান গোরা উপন্যাসে কিভাবে শৈল্পিক মাত্রা পেয়েছে অতি সংক্ষেপে বললাম। কিন্তু ও সবের বাইরে সকল উপন্যাসিকের রচনাকর্মে একটি সর্বব্যাপী অতিরিক্ত চরম উপাদান থাকে। তাকে বলতে পারি লেখকের 'Philosophy of Life' বা জীবনদর্শন। সমগ্র গোরা উপন্যাসে জড়িতমিশ্রিত হয়ে আছে আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি মনীষী রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ, স্বদেশপ্রেম, ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা ও নরনারীর প্রেমসম্পর্কের যথার্থ মূল্যায়নসংক্রান্ত অভিমত। এই মূল্যবান ভাবব্যঞ্জনা উপন্যাসটির গৌরব বহুগুণ বাড়িয়েছে। স্মরণ করুন উপন্যাসের সমাপ্তিতে গোরার মহৎ উচ্চারণ—

"গোরা কহিল, 'দেখুন পরেশবাবু, কাল রাত্রে আমি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলুম যে আজ প্রাতঃকালে আমি যেন নূতন জীবনলাভ করি। এতদিন শিশুকাল থেকে আমাকে যে কিছু মিথ্যা যে কিছু অশুচিতা আবৃত করেছিল আজ যেন তা নিঃশেষে ক্ষয়ে গিয়ে আমি নবজন্ম লাভ করি। আমি ঠিক যে কল্পনার সামগ্রীটি প্রার্থনা করেছিলুম ঈশ্বর সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেননি—তিনি তাঁর নিজের সত্য হঠাৎ একেবারে আমার হাতে এনে দিয়ে আমাকে চমকিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে এমন করে আমার অশুচিতাকে একেবারে সমূলে ঘুচিয়ে দেবেন তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি'। বলাবাহুল্য এখানে গোরার ভিতর দিয়ে লেখকের জীবনদর্শনই প্রকাশ। ধর্মের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা ছেড়ে মানবধর্মের উদার ব্যাখ্যা গোরা উপন্যাসের একটা মূলকথা এবং রবীন্দ্রীয় ভাবনার এই এক উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব শিল্পের মায়াদর্পনে।

উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব ও গোরা প্রসঙ্গে বলতে পারি এ উপন্যাসে উপন্যাসশিল্পের চরম উৎকর্ষই লক্ষ্য করি, প্রতিটি উপাদান প্রতিভার রসায়নে এক অপূর্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যময় নির্মিতি পেয়েছে।

## ৬.৩ যুগলবন্ধু চরিত্র—গোরা ও বিনয়

গোরা উপন্যাসের বিখ্যাত যুগলবন্ধু চরিত্র গোরা ও বিনয়, এরা স্বভাবে বিপরীত, পরস্পরের পরিপূরক, এইজন্যই একে অন্যকে আকর্ষণ করে। চরিত্রের শিল্পতত্ত্ব নিয়ে ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের তাত্ত্বিকেরা অনেক কথা বলেছেন। যেমন মার্টিন টার্নেল ফরাসী উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন, চরিত্র শব্দগুচ্ছ দিয়ে রচিত বইএর বাইরে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ চরিত্ররচনায় কল্পনার ভূমিকা যেমন আছে তেমনি চরিত্র বিচার করতে গেলে উপন্যাসের শব্দঅবয়ব ভাষাঅবয়বই বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এডুইন ম্যুইর (Edwin Muir) তাঁর 'The Structure of the Novel' গ্রন্থে "the novel of character" এই বাকবন্ধ ব্যবহার করেছেন—উপন্যাস অনেকটাই চরিত্রনির্ভর। গোরা উপন্যাস অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে গোরা চরিত্রের জন্য অথবা টলস্টয়ের "War and Peace" যেমন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে পিটার বেজুকভ অথবা প্রিন্স অ্যান্ড্রু চরিত্রের জন্য। উপন্যাসের চরিত্রে অনেক সময় বাস্তব মানুষের আদল থাকতে পারে সমকালীন কোন মানুষ এই চরিত্রসৃষ্টির নেপথ্যে থাকতে পারে; কিন্তু লেখক তাকে কল্পনা মিশিয়েই তৈরী করেন, তার বাস্তবমূলটুকু প্রায় যেন মুছেই দেন। তাই গোরা, বিনয় প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে কোন বাস্তব মানুষের আভাস আছে কিনা এই প্রশ্ন আজ আর তত গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং এইসব চরিত্র যথার্থ কল্পনার সামগ্রী হয়ে উঠতে পেরেছে কি না, তারা যথেষ্ট জীবন্ত ও নাটকীয় কিনা—এইসব প্রশ্নই বিচার্য। উপন্যাসশিল্পীর প্রতিভার রসায়নই উপন্যাসের চরিত্রকে পরিবর্তিত আলোয় দেখায়। চরিত্রগুলি লেখককে যেন ঘিরে ধরে, এমনকি তাঁর অস্তিত্বের অংশ হয়ে যায়, তাঁর নিজস্ব স্বপ্ন ও কামনাকে আকর্ষণ করে নেয়। তাই গোরা উপন্যাসে

অনেকসময় বিনয়ের ভিতর আমরা অনুভব করি রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের হৃদয়স্পন্দন; গোরার মনীষাদৃপ্ত ব্যক্তিত্বে তার স্বদেশপ্রেমে ও আদর্শবাদে সঞ্চারিত হয় রবীন্দ্রীয় 'ক্যারিসমা' বা বোধদীপ্ত প্রত্যয়পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিভা। একটু উদাহরণ দিচ্ছি—"এমন দিনে বিনা কাজের অবকাশে বিনয়ভূষণ তার বাসার দোতলার বারান্দায় একলা দাঁড়াইয়া রাস্তার জনতার চলাচল দেখিতেছিল।.....

আলখাল্লা-পরা একটা বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিয়া এই অচীন পাখির গানটা লিখিয়া লয়, কিন্তু ভোর রাতে যেমন শীত শীত করে অথচ গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে উদ্যম থাকে না, তেমনি একটা আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হইল না, গান লেখাও হইল না, কেবল ঐ অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুণগুণ করিতে লাগিল।"

এরকম অনুভূতিময় বাক্যব্যবহার আমরা ছিন্নপত্রাবলীর অনেক জায়গায় পেয়েছি কিম্বা পূর্ববর্তী জীবনস্মৃতিতে। আর রবীন্দ্রনাথের ওই বাউল পংক্তি দুটি যে কত প্রিয় তাও কারোর অবিদিত নয়। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যায় এখানে উপন্যাসের চরিত্ররূপে বিনয় হয়েও স্বরূপে সে যেন কিছুটা রবীন্দ্রনাথের সমভাগী হয়ে উঠেছে।

এবার গোরাচরিত্র প্রসঙ্গে যাচ্ছি। উপন্যাসের সমাপ্তি অংশে পরেশবাবুকে গোরা যে কথা বলেছিল স্মরণ করি—"গোরা কহিল, 'পরেশবাবু, এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি—একটা-না-একটায় জায়গায় বেধেছে সেইসব বাধার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার মিল করবার জন্য আমি সমস্ত জীবন দিন-রাত কেবলই চেষ্টা করে এসেছি—এই শ্রদ্ধার ভিত্তিকেই খুব পাকা করে তোলবার চেষ্টায় আমি আর কোনো কাজই করতে পারিনি—সেই আমার একটিমাত্র সাধনা ছিল। সেইজন্যই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রতি সত্যদৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে গিয়ে আমি বারবার ভয়ে ফিরে এসেছি—আমি একটি নিষ্কণ্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্যে এতদিন আমার চারিদিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি। আজ এক মুহূর্তেই আমার সেই ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেছে। আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখদুঃখ জ্ঞান-অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের মধ্যে এসে পৌঁচেছে—আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি—সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে—সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়—সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্র।"

বলাবাহুল্য নাটকীয়ভাবে রূপান্তরিত পরিবর্তিত নবজন্মলব্ধ নিজের মানবপরিচয়লাভে বলশালী গোরার এই উদ্দীপ্ত বাকচ্ছটা আমাদের কখন যেন নিজেদের অগোচরে 'কালান্তরের' জগতে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার জগতে নিয়ে যায়। গোরার চরিত্রের ভিতর অনুবিস্ট হয়েছে মহৎ রবীন্দ্রীয় জীবনদর্শন সন্দেহ নেই। সেই দর্শনের মূলকথা স্বদেশপ্রেমে কর্মের সঙ্গে সত্য ও কল্যাণের যথার্থ যোগ।

জীবনের মালা থেকে খসে এসে পড়েছিল হাসি, আনন্দ, বেদনা আর উপন্যাসকার তাদের নিয়েই রচনা করেছিলেন তাঁর সৌন্দর্যলোক তথা দ্বিতীয় ভুবন। সুচরিতা, ললিতার মত নারীদের লেখক নিশ্চয়ই দেখেছিলেন—তাঁর নিজস্ব ব্রাহ্মসমাজবৃত্তের মধ্যেই তারা হয়তো ছিল। কিন্তু তারা তো ব্রাহ্ম বা হিন্দু নয়, তারা বাঙালিনী—চিরকালের মানবী, কখনো তেজে জ্বলে উঠছে কখনো বা আত্মসমর্পণে হয়ে উঠেছে কমনীয়। গোরা ও বিনয় চরিত্রদুটিকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্যই এদের অবতারণা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাশাপাশি দুটি অনুচ্ছেদে অবিস্মরণীয় যুগলবন্ধু চরিত্রের উপস্থাপনা করেছেন। লেখকের বৈশিষ্ট্য তিনি চেহারার বর্ণনা দিয়ে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলেন—

"সে ছিল সভাপতি তাহার নাম গৌরমোহন; তাহাকে আত্মীয়বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকিয়াছে। সে চারিদিকের সকলকে যেন খাপছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে তাহার কলেজের পণ্ডিতমশাই রজতগিরি বলিয়া ডাকিতেন। তাহার গায়ের রঙটা কিছুটা উগ্ররকমের সাদা—হলদের আভা তাহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই। মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মতো বড়ো—গলার আওয়াজ এমন মোটা ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনিলে 'কে রে' বলিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড়ো এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুত; চোয়াল এবং চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মতো; চোখের উপর ভ্রুরেখা নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপালটা কানের দিকে চওড়া হইয়া গেছে। ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা; তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মতো ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোটো কিন্তু তীক্ষ্ণ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মতো অতিদূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য ঠিক করিয়া আছে অথচ এক মুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিসকেও বিদ্যুতের মতো আঘাত করিতে পারে। গৌরকে দেখিতে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই, সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই।

আর তাহার বন্ধু বিনয় সাধারণ বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত নম্র অথচ উজ্জ্বল; স্বভাবের সৌকুমার্য ও বুদ্ধির প্রখরতা মিলিয়া তাহার মুখশ্রীতে একটা বিশিষ্টতা দিয়াছে। কলেজে সে বরাবরই উচ্চ নম্বর ও বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে; গোরা কোনোমতেই তাহার সঙ্গে সমান চলিতে পারিত না। বিনয়ই তাহার বাহন হইয়া কালেজের পরীক্ষা কয়টার ভিতর দিয়া নিজের পশ্চাতে তাহাকে টানিয়া পার করিয়া আনিয়াছে।"

বোঝা যায় গোরা কর্মিষ্ঠ, আদর্শবাদী, দৃঢ়চরিত্রের অধিকারী; বিনয় বুদ্ধিবাদী ও ভাবুক। E.M. Forster তাঁর Aspects of the Novel গ্রন্থে বলেছেন—"We may divide characters into flat and round." দুই ধরণের চরিত্র আছে সমতল বা একপেশে ও ডৌল বা বহুমাত্রিক। একপেশে চরিত্রকে টাইপ চরিত্রও বলা হয়—তারা একমুখী প্রবণতাযুক্ত, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম থাকে, পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু ডৌল বা বহুমাত্রিক চরিত্র পরিবর্তিত হয়, নাটকীয়—আমাদের তার দিক বদলে আশ্চর্য করে দেয় কিন্তু সে দিকবদল কার্যকারণযুক্ত, আকস্মিক নয়; তার মধ্যে আছে জীবনের অনির্দেশ্যতা, "The test of a round character is whether it is capable of surprising in a convincing way..... It has the incalculability of life in it". লক্ষ্য করলে দেখা যায় গোরা এবং বিনয় উভয় চরিত্রেই ডৌল বা বহুমাত্রিক চরিত্রের লক্ষণ আছে, গোরা চরিত্রে অবশ্য পরিবর্তন কিছু বেশি। তুলনায় হারান বা পানুবাবুকে টাইপ চরিত্র বা শ্রেণীপ্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র বলতে পারি।

গোরা একদিকে পরম মাতৃভক্ত, কিন্তু সে নিজের এই অটুট মাতৃভক্তির জন্য তার হিন্দুসামাজিক আচারনিষ্ঠাকেই কারণ হিসেবে কিছুটা নির্দেশ করে। আবার বিনয়ের অতিরিক্ত হৃদয়বত্তা বা ভাবাবেগকেও তার সেরা পদ্ধতি বলে মনে হয়না। সে বস্তুত কঠোরতার ভক্ত। তার প্রাসঙ্গিক সংলাপ তুলছি—"মা কাকে বলে সে আমি জানি। আমাকে কি সে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে! আমার মার মতো মা কজনের আছে, কিন্তু আচার যদি না মানতে শুরু করি তবে একদিন হয়তো মাকেও মানব না। দেখো বিনয়, তোমাকে একটা কথা বলি, মনে রেখো—হৃদয় জিনিসটা অতি উত্তম, কিন্তু সকলের চেয়ে উত্তম নয়।"

বিনয়ের পরিবর্তন উপন্যাসের শুরুতেই। তার মনে দ্বন্দ্ব জেগে উঠেছে—"মত এবং মানুষে তাহার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিয়াছিল।" সে এতাবৎ গোরার মতকেই নিজের মত বলে জেনেছে এবং এই নিঃসঙ্গ যুবা আনন্দময়ীকে নিজের মার মতই মনে করে। "এখনকার কালের নানাপ্রকার তামাশা এবং গোপন আঘাত হইতে সমাজ

যদি আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে চায় তবে খাওয়া ছোঁয়া প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাহাকে বিশেষভাবে সতর্ক হইতে হইবে এই মতটি বিনয় গোরার মুখ হইতে অতি সহজেই গ্রহণ করিয়াছে, এ লইয়া বিরুদ্ধ লোকদের সঙ্গে সে তীক্ষ্ণভাবে তর্ক করিয়াছে;" এবং "গোরার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে বিনয় যেদিন হইতে আনন্দময়ীকে জানিয়াছে সেদিন হইতে তাহাকে মা বলিয়াই জানিয়াছে।"—এই বাক্যদুটি প্রাণধানযোগ্য।

বিনয়ের চিত্তবদলের সূচনা সুচরিতার সঙ্গে অকস্মাৎ সাক্ষাতে ও পরেশবাবুদের বাড়ি গিয়ে ললিতার সঙ্গে পরিচয় ও ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধীয় ধারণাবলীর সঙ্গে কথঞ্চিৎ পরিচয়ে। "বিনয় পদে পদে তাহাদের দলের ভারতবর্ষের অনেক নিষেধ মানিয়াছে। অনেক সময় দ্বিধাবোধ করিয়াছে, তবু মানিয়াছে। আজ তাহার মনের মধ্যে একটা বিদ্রোহ দেখাদিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ভারতবর্ষ যেন কেবল নিষেধেরই মূর্তি।" বিনয় চরিত্রের বিকাশ দু'ভাবে ঘটেছে একদিকে গোরার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে, অন্যদিকে ললিতার সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে। এই দুটি জিনিসে প্রথমে ছিল সংঘাত পরে ঘটল প্রার্থিত সমন্বয় বা পরিণামরমনীয়তা।

বিনয় গোরাকে শুধু বন্ধুরূপে ভালোবাসে না, নেতারূপে শ্রদ্ধা করে। পরেশবাবুর বাড়ীতে বিনয়কে তার বন্ধু সম্পর্কে কৌদূহলী জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হয়েছিল—"বিনয় তাহার বন্ধুর কথা আলোচনা করিতে করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। গোরার যে কিরূপ অসামান্য প্রতিভা, তাহার হৃদয় যে কিরূপ প্রশস্ত, তাহার শক্তি যে কিরূপ অটল তাহা বলিতে গিয়া বিনয় যেন কথা শেষ করিতে পারিল না। গোরা যে একদিন সমস্ত ভারতবর্ষের মাথার উপরে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে—বিনয় কহিল, 'এ বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নাই'।"

গোরার হিন্দুধর্মকে আঁকড়ে ধরা, তার বহিরঙ্গ নিয়ে অতি উৎসাহ কিন্তু আসলে ছিল তার শুদ্ধ স্বদেশপ্রেমেরই পরিচয়। "কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি যে সাধারণ লোকদের দুর্গতি দেখিয়া বিদেশীকে ডাকিয়া লইয়া নিজের শ্রেষ্ঠতা অভিমানে হাসিতে পারে, ইহার আক্রোশ গোরাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেশের জনসাধারণ এমন করিয়া নিজেদের সকলপ্রকার অপমান ও দুর্ব্যবহারের অধীনে আনিয়াছে, তাহাদিগকে পশুর মতো লাঞ্ছিত করিলে তাহারাও তাহা স্বীকার করে এবং সকলের কাছেই তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, ইহার মূলে যে একটা দেশব্যাপী সুগভীর অজ্ঞান আছে তাহার জন্য গোরার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সকলের চেয়ে তাহার এই বাজিল যে, দেশের এই চিরন্তন অপমান ও দুর্গতিকে শিক্ষিত লোক আপনার গায়ে লয় না—নিজেকে নির্মমভাবে পৃথক করিয়া লইয়া অকাতরে গৌরব বোধ করিতে পারে। আজ তাই শিক্ষিত লোকদের সমস্ত বইপড়া ও নকলকরা সংস্কারকে একেবারে উপেক্ষা করিবার জন্যই গোরা কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ লাগাইয়া ও একটা নূতন অদ্ভুত কটকি চটি কিনিয়া পরিয়া বুক ফুলাইয়া ব্রাহ্মবাড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল। অতএব বলতে পারি গোরার এই প্রকাশিত অহং-এর মধ্যে স্বাদেশিকতার সুরই বেশী করে বেজেছে।

সুচরিতার সঙ্গে প্রণয়ে গোরার প্রতিদ্বন্দী হারানবাবু। আবার ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে তর্কবিতর্কেও গোরা হারাণবাবুর প্রধান বিরোধীপক্ষ। হারাণবাবু বাঙালি সমাজের নানা কু-প্রথার উল্লেখ করে তাদের নিন্দা করেছিলেন। গোরা কিন্তু এর জন্য হারাণবাবুর মিথ্যা ইংরেজ অনুকরণকেই দায়ী করেছিল—"গোরা কহিল, 'আপনি যাকে কুপ্রথা বলছেন সে কেবল ইংরেজি বই মুখস্থ করে বলছেন, নিজে এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না'।" অতএব গোরা দেশ সম্বন্ধে পুঁথিগত বিদ্যা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরই জোর দিতে চায়।

গোরা চরিত্রের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য বিনয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের দিকটি বিশেষ আলোচনা যোগ্য। বিনয়ের সঙ্গে কথাবার্তায় তর্কবিতর্কে দ্বন্দ্বসংঘাতে গোরা চরিত্রের স্ফুলিঙ্গদীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত—এইসব অংশগুলি গোরা উপন্যাসের বহুমাত্রিক আবেদন বাড়িয়েছে।

সুচরিতার সঙ্গে যখন গোরার পরিচয় হ'ল তখন গোরা তার হৃদয়ের নবআবির্ভূত প্রেমকে প্রথমে স্বীকার করে

নি, বরং সে ওই নারীকে তার নারীত্বসমেত স্বদেশপ্রেমের আচরণমণ্ডিত করেই দেখতে অভ্যস্ত ছিল। রচনাংশ উদ্ধৃত করে বক্তব্যের সমর্থনে একটু উদাহরণ দিচ্ছি—"ভারতবর্ষের নানাপ্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল।" সে যে তথাকথিত গোঁড়া হিন্দু নয় একথাটা বিশেষ জোরের সঙ্গে সুচরিতাকে জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। এককথায় এই অসাধারণ উপন্যাসের রবীন্দ্রীয় নায়ক নায়িকার সঙ্গে কথোপকথনকালেও প্রেমের অনুরণন নয় স্বদেশপ্রেমের উদাত্ত ঝংকারকেই তার জীবনবীণার তারে তারে ঝংকারিত করে তুলেছিল। চারদেয়ালের বন্দিনী আত্মমুগ্ধা সুচরিতার মনে সে যেন ভিতরে ভিতরে একটা বৃহৎজীবনের আহ্বান জাগিয়ে তুলল।

গোরা ভ্রমণে বেরিয়েছিল, গ্রাম্য ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে গ্রহণ করবে বলে। সেই ভ্রমণকালে গোরা দেশজোড়া দারিদ্রের দুঃখ, অস্পৃশ্যতার অপরাধ, হিন্দুমুসলমান সম্পর্কের দৈন্যতা সম্বন্ধে কিছু ধারণ করতে পেরেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবদা অপেক্ষা আদর্শবাদ ও একপ্রকার উৎকট স্বপ্নের মায়াঘোরই তাকে যেন বেশী আচ্ছন্ন করেছিল। পরিব্রাজক গোরার যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে সেই গোরাকে যেন এক অলৌকিক তত্ত্বমূর্তি, উদ্দেশ্যবাদের বিগ্রহ অথবা গ্রহান্তরের মানুষ বলে মনে হয়—"লোকটাকে দেখিয়া সাহেব কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। এমন ছয়ফুটের চেয়ে লম্বা, হাড়মোটা, মজবুত মানুষ তিনি বাংলাদেশে পূর্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। ইহার দেহের বর্ণও সাধারণ বাঙালির মতো নহে। গায়ে একখানা খাকি রঙের পাঞ্জাবি জামা, ধুতি মোটা ও মলিন, হাতে একগাছা বাঁশের লাঠি, চাদরখানাকে মাথায় পাগড়ির মতো বাঁধিয়াছে।"

গোরা যখন তার অনুগামী ছাত্রদের সঙ্গে ইংরেজের পুলিশের কাছে গ্রেপ্তারবরণ করল, তাকে তার—হাজতবাস থেকে মুক্ত করতে চেষ্টিত হয় বিনয়। অধিকন্তু গোরা পেয়েছিল সুচরিতা ও ললিতার সপ্রশংস সহানুভূতি।

পিতা কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে গোরার সম্পর্কে জটিলতা ছিল। উপন্যাসের প্রায় সমাপ্তি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"কৃষ্ণদয়ালের কোনো কথায় কোনোদিন গোরার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। আজও সে তাঁহার আদেশ পালন করিবে বলিয়া মনের মধ্যে স্বীকার করিল না। সাংসারিক জীবনের চেয়ে বড়ো যে জীবন, সেখানে গোরা পিতামাতার নিষেধকে মান্য করিতে নিজেকে বাধ্য মনে করে না। কিন্তু তবু আজ সমস্ত দিন তাহার মনের মধ্যে ভারি একটা কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কৃষ্ণদয়ালের সমস্ত কথার মধ্যে কী একটা সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার মনের ভিতরে এইরকম একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে ছিল। একটা যেন আকারহীন দুঃস্বপ্ন তাহাকে পীড়ন করিতে ছিল, তাহাকে কোনোমতেই তাড়াইতে পারিতেছিল না। তাহার কেমন একরকম মনে হইল কে যেন সকল দিক হইতেই তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। নিজের একাকীত্ব তাহাকে আজ অত্যন্ত একটা বৃহৎ কলেবর ধরিয়া দেখা দিল। তাহার সম্মুখে কর্মক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ, কাজও অতি প্রকান্ড, কিন্তু তাহার পাশে কেউই দাঁড়াইয়া নাই। স্পষ্ট বুঝতে পারি গোরা চরিত্র এক গভীর আত্মিক সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের সমাপতনে এই আত্মিক সংকটের অভিনব নিরসনও দেখিয়েছেন।

কৃষ্ণদয়াল অসুস্থ অবস্থায় ভেবেছিলেন তাঁর মৃত্যু সন্নিকট। তাই গোরাকে তিনি তার আত্মপরিচয় জানালেন। 'গোরা চকিত হইয়া কহিল, 'আমি ওঁর পুত্র নই?'

আনন্দময়ী করিলেন, 'না'।

অগ্নিগিরির অগ্নিউচ্ছ্বাসের মতো তখন গোরার মুখ দিয়া বাহির হইল, 'মা, তুমি আমার মা নও?'

আনন্দময়ীর বুক ফাঠিয়া গেল; তিনি অশ্রুহীন রোদনের কণ্ঠে কহিলেন, 'বাবা, গোরা, তুই যে আমার পুত্রহীনার পুত্র, তুই যে গর্ভের ছেলের চেয়ে অনেক বেশি বাবা।'

গোরা তখন কৃষ্ণদয়ালের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'আমাকে তবে তোমরা কোথায় পেলে?'

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, 'তখন মিউটিনি। আমরা এটোয়াতে। তোমার মা সিপাহিদের ভয়ে পালিয়ে এসে রাত্রে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তোমার বাপ আগের দিনেই লড়াইয়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল—'

গোরা গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, 'দরকার নেই তাঁর নাম, তার নাম আমি জানতে চাইনে।'

কৃষ্ণদয়াল গোরার এই উত্তেজনায় বিস্মিত হইয়া থামিয়া গেলেন। তারপর বলিলেন, তিনি আইরিশম্যান ছিলেন। সেই রাত্রেই তোমার মা তোমাকে প্রসব করে মারা গেলেন। তারপর থেকেই তুমি আমাদের ঘরে মানুষ হয়েছ।"

এভাবেই গোরার নবজন্ম হল। "গোরা কহিল, 'পরেশ বাবু, এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্য সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি—একটা না একটা জায়গায় বেধেছে—সেইসব বাধার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার মিল করবার জন্য আমি সমস্ত দিনরাত কেবলই চেষ্টা করে এসেছি—এই শ্রদ্ধার ভিত্তিকেই খুব পাকা করে তোলবার চেষ্টায় আমি আর কোনো কাজই করতে পারি নি—সেই আমার একটি মাত্র সাধনা ছিল। সেইজন্যেই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রতি সত্যসৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে গিয়ে আমি বারবার ভয়ে ফিরে এসেছি—আমি একটি নিষ্কণ্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্যে এতদিন আমার চারদিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি! আজ এক মুহূর্তেই আমার সেই ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেছে। আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখদুঃখ জ্ঞানঅজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পৌঁচেছে—আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি। সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে—সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়—সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কর্মক্ষেত্র'।" —গোরার এই উত্তরণ তার মুখের দেশপ্রেমের বাণীকে প্রায় রবীন্দ্রবাণীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। (দ্রষ্টব্য 'কালান্তর' গ্রন্থ)। এজন্যই বলতে পারি গোরা চরিত্রের উপসংহার গড়ে তুলেছে এক বিশিষ্ট রবীন্দ্রীয় জীবনদর্শন। স্বদেশপ্রেম সেখানে উদার বিশ্বপ্রেম ও মানবতাবাদের সঙ্গে জড়িত। গোরার সংকীর্ণ ধর্মপরিচয় লুপ্ত হয়ে গেল; এবার সে খোলা মনে সুচরিতার মধ্যে আপনার প্রেমপরিচয় অন্বেষণ করতে পারবে।

গোরা জেনেছে সে তার অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে ভারতবর্ষের কোলের উপর নূতন করে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সুচরিতা গোরাকে দেখে ভেবেছিল আজও তার যুদ্ধের সাজ; কিন্তু গোরার মন প্রেমের সাজ পরেই এসেছিল।—"গোরা হাসিয়া কহিল, 'সুচরিতা, আমি আর তোমার গুরু নই। আমি তোমার কাছে এই বলে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমার হাত ধরে তোমার ঐ গুরুর কাছে আমাকে নিয়ে যাও।'

এই বলিয়া গোরা তাহার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। সুচরিতা চৌকি হইতে উঠিয়া নিজের হস্ত তাহার হস্তে স্থাপন করিল।"

William H. Gass মন্তব্য করেছেন—"A great character has an endless interest, its fascination never wanes." (The concept of character in Fiction : Essentials of the Theory of Fiction; ed. by Michael I Hoffman and Patrick D Murphy) — একটা মহৎ চরিত্রের অসীম সম্ভাবনা, এর আকর্ষণ কখনো ফুরায় না, সমালোচকের এই উক্তি গোরা চরিত্র সম্বন্ধে খুবই প্রযোজ্য। সন্দেহ নেই জীবনের মাল্য থেকে সহসা খসে পড়া এক অপরূপ ভাববীজ থেকেই কবি তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাসের নায়কের সূচনা করেছিলেন, জীবন রহস্যের সৌন্দর্য এই চরিত্রে বহুলভাবে ফুটে উঠেছে এবং গ্রন্থ সমাপ্ত হলেও গোরা চরিত্রটিকে আমরা সহজে ভুলতে পারি না।

গোরা চরিত্রে যদি থাকে নায়কোচিত বিভা তাহলে বিনয় চরিত্রে রয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালীর

সূক্ষ্ম মনন ও হৃদয়াবেগের প্রতিফলন। পাশাপাশি তার মধ্যে রয়েছে প্রেমের মনস্তত্ত্ব—ললিতার সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় এই মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। তার চরিত্রের আর একটি মাত্রা প্রখর আদল পেয়েছে গোরার সঙ্গে বন্ধুত্বের আত্মহারা সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। বিনয়ের জীবনে নারীর প্রথম আবির্ভাব সুচরিতার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতে, এ যেন প্রায় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত অভিজ্ঞতা—"বেলা বাড়িয়া চলিল, বর্ষার রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, গাড়ির স্রোত অফিসের দিকে বেগে ছুটিতে লাগিল, বিনয় তাহার দিনের কোনো কাজেই মন দিতে পারিল না। এমন অপূর্ব আনন্দের সঙ্গে এমন নিবিড় বেদনা তাহার বয়সে কখনো সে ভোগ করে নাই। তাহার এই ক্ষুদ্র বাসা এবং চারিদিকের কুৎসিত কলিকাতা মায়াপুরীর মতো হইয়া উঠিল, .....এই বর্ষপকৃতির রৌদ্রের দীপ্ত আভা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হইল, তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা জ্যোতির্ময় যবনিকার মতো পড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের তুচ্ছতাকে একেবারে আড়াল করিয়া দিল।" পরে যখন উপন্যাসের ঘটনাস্রোত এগিয়ে চলল তখন দেখি সুচরিতা নয় ললিতাই হয়ে উঠল এই নবযুবার হৃদয়ের মানবী।

বিনয়ের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন—"আর তাহার বন্ধু বিনয় সাধারণ বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত নম্র, অথচ উজ্জ্বল; স্বভাবের সৌকুমার্য ও বুদ্ধির প্রখরতা মিলিয়া তাহার মুখশ্রীতে একটা বিশিষ্টতা দিয়াছে। কলেজে সে বরাবরই উচ্চ নম্বর ও বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে।" বিনয়ের গোরার সঙ্গে বন্ধুত্ব, সেই বন্ধুত্বের সম্পর্কের টানাপোড়েন, মানঅভিমান, গোরার প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আত্মসমর্পন আলোচ্য উপন্যাসের অন্যতম বর্ণিত বিষয়। "মধ্যাহ্নে গোরার কাছে যাইবার জন্য বিনয়ের মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিনয় গোরার কাছে নিজেকে নত করিতে কোনোদিন সংকোচ বোধ করে নাই। কিন্তু নিজের অভিমান না থাকিলেও বন্ধুত্বের অভিমানকে ঠেকানো শক্ত। ..... বাসা হইতে খানিকটা দূর বাহির হইয়া বিনয় আবার ফিরিয়া আসিল; বন্ধুত্ব পাছে অপমানিত হয় এই ভয়ে সে গোরার বাড়িতে যাইতে পারিল না।" আসলে বিনয় ও গোরা হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে সহমতই পোষণ করত যদিও বিনয় কখনই গোরার মত হিন্দু ধর্মের উগ্র সমর্থক ছিল না। সে যখন ব্রাহ্মধর্মের চক্রে প্রবেশ করল, ললিতার প্রতি ভালোবাসা ও পরেশবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করল তখন দুই বন্ধুর সম্পর্কে একটা সূক্ষ্ম চিড় ধরল। দুজনের যাত্রাপথ আলাদা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, কাহিনীর শেষে আবার দুজনের সখ্যতার পরিপূর্ণ মিলন ঘটে।

বিনয়ের মধ্যে ছিল বুদ্ধি ও প্রকাশক্ষমতা। গোরাকে সে একজন প্রতিভাধর বা genius বলেই জানত। সুচরিতাকে তাই বলতে পেরেছিল—"আমি আপনাকে বলছি, আমার বন্ধু গোরা ভারতবর্ষের সেই আত্মবোধের প্রকাশরূপে আবির্ভূত হয়েছে। তাকে আমি সামান্য লোক বলে মনে করতে পারি নে।" নির্জন ছাতে কত জ্যোৎস্নারাতে গোরার সঙ্গে সাহিত্যসমাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ে সে কত কথা বলেছে। আজ সে গোরাকে তার প্রেমের কথা বলতে বসেছে। বস্তুত ললিতার সঙ্গে তার প্রণয়ই বিনয় চরিত্রে অতুচ্ছের আলো ফেলেছে এবং তাকে রোমান্টিসিজমের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছে ও কল্পনার প্রভু করেছে। "সে কী মুখ! প্রাণের আভা তাহার কপালের কোমলতার মধ্যে কী সুকুমারভাবে প্রকাশ পাইতেছে। হাসিতে তাহার অন্তঃকরণ কী আশ্চর্য আলোর মত ফুটিয়া পড়ে। ললাটে কী বুদ্ধি! এবং ঘন পল্লবের ছায়াতলে দুই চক্ষুর মধ্যে কী নিবিড় অনির্বচনীয়তা! আর সেই দুটি হাত—সেবা এবং স্নেহকে সৌন্দর্যে সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, সে যেন কথা কহিতেছে। বিনয় নিজের জীবনকে যৌবনকে ধন্য জ্ঞান করিতেছে, এই আনন্দে তাহার বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যাহা না দেখিয়াই জীবন সাঙ্গ করে—বিনয় যে তাহাকে এমন করিয়া চোখের সামনে মূর্তিমান দেখিতে পাইবে ইহার চেয়ে আশ্চর্য কিছুই নাই।"

ললিতাকে কেন্দ্র করেই বিনয়ের জীবনে এই প্রেমের আবির্ভাব। এই প্রেমের কথা সে মুখ ফুটে গোরাকে বলতে

চেয়েছিল। গোরার হাজতবাস এবং স্টীমারযোগে কলকাতা যাত্রায় ললিতার কিছুটা আকস্মিকভাবে বিনয়ের যাত্রাসঙ্গী হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিনয় চরিত্র তার পূর্ণতার পথে এগিয়েছে। একদিকে প্রীতির নিকষে ঘসে সে গোরার প্রতি বন্ধুত্বের সম্যক পরিচয় পেয়েছে অন্যদিকে ললিতাকে তার জীবনের পরিপূর্ণ প্রেমপ্রতিমা বলে চূড়ান্তভাবে জেনেছে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে পাঠ বা Text থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"পূর্বে হইলে ললিতার এই দুঃসাহসিকতায় বিনয়ের মনে তিরস্কারের উদয় হইত—আজ তাহা কোনোমতেই হইল না। এমন কি, তাহার মনে যে বিস্ময়ের উদয় হইয়াছিল তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ছিল—ইহাতে আরো একটি আনন্দ ছিল, তাহাদের সমস্ত দলের মধ্যে গোরার অপমানের সামান্য প্রতিকারচেষ্টা কেবল বিনয় এবং ললিতাই করিয়াছে। এজন্য বিনয়কে বিশেষ কিছু দুঃখ পাইতে হইবে না কিন্তু ললিতাকে নিজের কর্মফলে অনেক দিন ধরিয়া বিস্তর পীড়া ভোগ করিতে হইবে।.... ললিতার কমনীয় স্ত্রীমূর্তি আপন অন্তরের তেজে বিনয়ের চক্ষে আজ এমন একটা মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দিল যে নারীর এই অপূর্ব পরিচয়ে বিনয় নিজের জীবনকে সার্থক বোধ করিল। সে নিজের সমস্ত অহংকার, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্যমণ্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জন দিল।"

গোরা ও বিনয় এই যুগলবন্ধুর চরিত্র গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। গোরা বিনয়কে বলেছিল, 'ভাই বিনয়, আমরা মরব, এক মরণে মরব। আমরা দুজনে এক, আমাদের কেউ বিচ্ছিন্ন করবে না, কেউ বাধা দিতে পারবে না।' আর বিনয় বলেছিল, 'ভাই গোরা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব।..... আমাদের দুইজনের এক পথ—কিন্তু আমাদের শক্তি তো সমান নয়। গোরা সাধনায় বিঘ্ন হবে বলে বিনয়কে পর্যন্ত ত্যাগ করতে চেয়েছে, বিনয় গোরার একাধিপত্যে ক্লান্ত হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে মনে মনে; শেষ পর্যন্ত তাদের জীবনে অসাধারণ যুগলনারীর আবির্ভাব এক সুন্দর প্রেমপথে দুজনকে নির্দ্বন্দ্বভাবে এক করে দিয়েছে। এর জন্য রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য বিচিত্র ঘটনাবলীর বয়ন করতে হয়েছে। হেনরি জেমস বলেছিলেন—"What is character but the determination of incident? What is incident but the illustration of character?"—চরিত্র ঘটনাকে নির্ধারিত করে, ঘটনা চরিত্রকে প্রকাশিত করে, এক কথায় ঘটনা ও চরিত্র ওতপ্রোত। (The Art of Fiction : Henry fames)। গোরা উপন্যাসের ঘটনাবলী গোরা ও বিনয় এই দুটি মূল চরিত্রকে ঘিরে বহুলাংশে আবর্তিত হয়েছে একথা বলা যায়। ললিতা ও সুচরিতা চরিত্রদুটি এই ঘটনাস্রোতে বেগ সঞ্চার করেছে।

## ৬.৪ যুগল নায়িকা—সুচরিতা ও ললিতা চরিত্র

সুচরিতা ও ললিতা রবীন্দ্রউপন্যাসের দুটি উজ্জ্বল নারীরত্ন, ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত, পরেশবাবুর সংসারের সদস্যা, একজন কন্যাস্থানীয়া ও অন্যজন কন্যা। গোরার প্রথম আবির্ভাব সুচরিতার নারী হৃদয়ে যে প্রবল ভাবতরঙ্গ তুলেছে রবীন্দ্রনাথ তা মনস্তাত্ত্বিক কুশলতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। গোরা দেশের দারিদ্রকে মেনে নিয়েও দরিদ্র ভারতবাসীকে ভালোবাসে, তাই সুচরিতা গোরাকে শ্রদ্ধা করেছে, পানুবাবুর সঙ্গে তর্কে গোরার পক্ষ সমর্থন করেছে। রাতে ভাবউদ্বেল চিত্তে বাড়ীর ছাদে সে একাকিনী, তার দুটি চক্ষু নিদ্রাহারা—"একজন অপরিচিত যুবা কপালে তিলক কাটিয়া আসিয়াছে, অথব তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া তাহার অহংকার নত করা গেল না এইজন্যই সুচরিতা এতক্ষণ ধরিয়া পীড়া বোধ করিতেছে ইহার অপেক্ষা অদ্ভুত হাস্যকর কিছুই হইতে পারে না। এই কারণটাকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মন হইতে সে বিদায় করিয়া দিল। তখন আসল কারণটা মনে পড়িল এবং মনে পড়িয়া তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইল। আজ তিন চার ঘণ্টা সুচরিতা সেই যুবকের সম্মুখেই বসিয়া ছিল এবং মাঝে মাঝে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তর্কেও যোগ দিয়াছে অথচ সে তাহাকে একেবারে যেন লক্ষমাত্র করে নাই—যাইবার সময়েও তাহাকে সে যেন চোখে দেখিতেই পাইল না। এই পরিপূর্ণ উপেক্ষাই যে সুচরিতাকে গভীর ভাবে বিধিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ

নাই। ..... গোরার উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল—গোরাকে সে কুসংস্কারাচ্ছন্ন উদ্ধত যুবক বলিয়া মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে চাহিল কিন্তু তবু সেই বিপুলকায় বজ্রকণ্ঠ পুরুষের সেই নিঃসংকোচ দৃষ্টির স্মৃতির সম্মুখে সুচরিতা মনে মনে অত্যন্ত ছোটো হইয়া গেল—কোনো মতেই সে নিজের গৌরব খাড়া করিতে পারিল না।"

বোঝা যাচ্ছে গোরার দৃপ্ত মূর্তি প্রথম দর্শনেই সুচরিতার কুমারীহৃদয়ে স্বর্ণিল রেখাপাত করেছে। অনুরূপ ঘটনা উপন্যাসে আরও আছে। হারাণবাবু ও গোরা তর্করত, সুচরিতা টেবিলের অপর প্রান্তে বসে আছে। "সুচরিতা যে গোরাকে অনিমেষ লোচনে দেখিতেছে সে সম্বন্ধে তাহার নিজের যদি চেতনা থাকিত তবে সে লজ্জিত হইত, কিন্তু সে যেন আত্মবিস্কৃত হইয়াই গোরাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। গোরা তাহার বলিষ্ঠ দুই বাহু টেবিলের উপরে রাখিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল; তাহার প্রশস্ত শুভ ললাটের উপর বাতির আলো পড়িয়াছে, ..... আজ সুচরিতা তাহার মুখের দিকে একমনে চাহিতে চাহিতে সমস্ত দল, সমস্ত মত, সমস্ত উদ্দেশ্য হইতে পৃথক করিয়া গোরাকে গোরা বলিয়াই যেন দেখিতে লাগিল। চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যবহারের অতীত করিয়া দেখিয়াই অকারণে উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে, সুচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমনি সমস্ত ভুলিয়া, তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার, তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যেন চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ কী, মানুষের আত্মা কি, সুচরিতা এই তাহা প্রথম দেখিতে পাইল এবং এই অপূর্ব অনুভূতিতে সে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল। সুচরিতা চরিত্রটি এভাবেই নারীর পুরুষের প্রতি আত্মনিবেদনের মহিমা নিয়ে এ উপন্যাসে ক্রমবিকশিত হয়েছে।

এবার নায়ক অর্থাৎ গোরার দৃষ্টি দিয়ে দেখা নায়িকা অর্থাৎ সুচরিতার রূপ ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনায় আসা যাক। ".....সেই সময়ে গোরা তাহার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া লইবার অবকাশ পাইয়াছিল। গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য, যে প্রগলভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়! তাহার মুখে তাহার বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কী সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে। মুখের ডৌলটি কি সুকুমার! ভ্রুযুগলের উপর ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ। ঠোঁট দুইটি চুপ করিয়া আছে, কিন্তু অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মতো রহিয়াছে। ..... সুচরিতার একটি হাত টেবিলের উপরে ছিল—তাহার জামার আস্তিনের কুঞ্চিত প্রান্ত হইতে সেই হাতখানি আজ গোরার চোখে কোমল হৃদয়ের একটি কল্যাণপূর্ণ বাণীর মতো বোধ হইতে লাগিল।..... দেখিতে দেখিতে সুচরিতার কপালের ভ্রষ্ট কেশ হইতে তাহার পায়ের কাছে শাড়ির পাড়টুকু পর্যন্ত অত্যন্ত সত্য এবং অত্যন্ত বিশেষ হইয়া উঠিল. একই কালে সমগ্র সুচরিতা এবং সুচরিতার প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্রভাবে গোরার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।" বলতে পারি সুচরিতা চরিত্রের অমোঘ আকর্ষণে প্রেমের ক্ষেত্রেও গোরার এক নবজাগরণ ঘটেছিল।

সুচরিতা চরিত্র হিসেবে অন্তর্মুখী—"নিজেকে সংবরণ করিয়া রাখাই সুচরিতার চিরদিনের স্বভাব ও অভ্যাস।" পিতৃস্থানীয় পরেশবাবুর প্রতি তার সেবামূলক মনোভাব, হারাণবাবুর প্রতি তার মনোভাব ক্রমশ প্রতিকূল।

পাশাপাশি ললিতা চরিত্রে কিঞ্চিৎ বহির্মুখী ছাপ আছে। সে প্রয়োজনে তেজ ও ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে। সুচরিতার প্রতি ভালোবাসায় তার এক পরিচয়, বিনয়ের প্রতি প্রেমে তার অন্য পরিচয়। ললিতা শুধু রূপসী নয় সে বিদ্রোহিনীও বটে। শুরুতে তার এক চেষ্টা ছিল বিনয়কে গোরার প্রভাবের বৃত্তের বাইরে আনা। গোরার সঙ্গে বিনয়ের মনের মিল আছে, সুচরিতার এ কথার সে প্রতিবাদ করেছে—"ললিতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, 'না, না, না, সম্পূর্ণ মিল নেই। গৌরমোহনবাবুকে মেনে চলা ওঁর অভ্যাস হয়েগেছে—সেটা দাসত্ব, সে ভালোবাসা নয়। অথচ উনি জোর করে মনে করতে চান যে তাঁর সঙ্গে ওঁর ঠিক এক মত,..... উনি গৌরমোহনবাবুকে মানছেন হয়তো ভালোবাসা থেকে, ....."।

ললিতা বিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কে তার্কিক থেকে ধীরে ধীরে প্রেমিকা হয়ে উঠেছিল—"ললিতাও বিনয়ের কাছে কবিতায় মন্ডিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ললিতা এতদিন তাহার তীব্রতার দ্বারা বিনয়কে অনবরত উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছিল।" ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গোরার হাজতবাসের আজ্ঞা এবং বিদ্রোহিনী ললিতার বিনয়ের সঙ্গে জাহাজে ষ্টীমারযাত্রায় ললিতা চরিত্র নতুন করে বাঁক নেয়। গোরার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কমে সে এখন অনুকূল। নতুন আলোয় ললিতাকে দেখে বিনয়ও এখন অধিকতর মুগ্ধ—"অথচ এই ললিতাকে বিনয় বরাবর গোরার বিরুদ্ধ বলিয়াই জানিত। যতই ভাবিতে লাগিল ততই ললিতার এই পরিণাম বিচারহীন সাহসে এবং অন্যায়ের প্রতি একান্ত ঘৃণায় তাহার প্রতি বিনয়ের ভক্তি জন্মিতে লাগিল। ..... ললিতার কমনীয় স্ত্রীমূর্তি আপন অন্তরের তেজে বিনয়ের চক্ষে আজ এমন একটি মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দিল যে, নারীর এই অপূর্ব পরিচয়ে বিনয় নিজের জীবনকে সার্থক বোধ করিল। সে নিজের সমস্ত অহংকার সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্যমন্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জন দিল।" তেজ ও সৌন্দর্যের সমবায়ে রচিত ললিতা চরিত্র এভাবেই গোরা উপন্যাসে জীবনের পথ দিয়ে হেঁটে চলে গেছে।

রবীন্দ্রনাথেরই তত্ত্ব অনুযায়ী সুচরিতাকে আমরা মা জাতের মেয়ে ও ললিতাকে প্রিয়াজাতের মেয়ে বলতে পারি, একজনের সঙ্গে লক্ষ্মীর অন্যজনের সঙ্গে উর্বশীর তুলনা। গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ realism-naturalism এর অর্থাৎ মনস্তত্ত্ববাহিত বাস্তবতারই পথবাহী হয়েছেন তবু বলা যায় সুচরিতা ও ললিতা এই দুটি শ্রীময়ী নারী চরিত্রকে অনেকটাই তিনি গীতিকবিতাসুলভ সৌন্দর্যের আধারে স্থাপন করেছেন। মনস্তত্ত্ব ও subjectivity বা আত্মমুখিনতা এ দুটি চরিত্রে ঢের রয়েছে । রালফ ফ্রীডম্যান যথার্থই বলেছেন—"Although lyrical writing is a rather specialised genre, it bears deep implications for modern writing as a whole"—সামগ্রিকভাবে একালের উপন্যাসে গীতিকাব্যিক ছাপ যথেষ্টই আছে, গীতিকাব্যিক রচনা সাহিত্যে জাতি হিসেবে যদিও স্বতন্ত্র। (The Lyrical Novel : Retrospect and Prognosis—Ralph Freedman; Essentials of the Theory of Fiction)। গোরা উপন্যাসে চরিত্রবয়নে ও ভাষাবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বহুসময়েই পাঠক-পাঠিকাকে গীতিকাব্যিক মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন।

## ৬.৫ অন্যান্য চরিত্র

গোরা উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আনন্দময়ী, কৃষ্ণদয়াল, বরদাসুন্দরী, হরিমোহিনী, মহিম, অবিনাশ, হারান বা পানুবাবু, পরেশবাবু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থে এদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। আনন্দময়ী চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। আইরিশশিশু গোরাকে বুকে ধারণ করে তিনি এক উদার বিশ্বমাতৃত্বের ধারণায় উন্নীত হয়েছেন। সমাজের সংকীর্ণ মতামতকে উপেক্ষা করার মত সৎসাহস তিনি এখান থেকেই অর্জন করেছিলেন। আনন্দময়ীর গোরার প্রতি উক্তি উদ্ধৃত করছি—"কিন্তু তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিয়ে দিয়েছি তা জানিস? ছোটো ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে জাতি নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। সে কথা যেদিন বুঝেছি সেদিন থেকে এ কথা নিশ্চয় জেনেছি যে আমি যদি খৃষ্টান বলে ছোটো জাত বলে কাউকে ঘৃণা করি তবে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। তুই আমার কোল ভরে আমার ঘর আলো করে থাক, আমি পৃথিবীর সকল জাতের হাতেই জল খাব।" উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখছি গোরা তাঁকে বলেছে—"মা তুমিই আমার মা। যে মাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।" বস্তুত মাতৃত্বের এক উদার রূপই আনন্দময়ী চরিত্রে দেখা যায়। কৃষ্ণদয়ালবাবু প্রথম জীবনে আনন্দময়ী শিবপূজা করলে ঠাকুর ছুঁড়ে ফেলতেন, পরে তিনিই উত্তরজীবনে উৎকট আচারতান্ত্রিক হিন্দুয়ানিতে মেতে ওঠেন। তাঁকে ঘিরে এ অংশে অল্পস্বল্প হাস্যরসও ফুটেছে। গোরার সঙ্গে তাঁর যুগবৎ ঘৃণা ও ভালোবাসার সম্পর্ক। বরদাসুন্দরী

সংকীর্ণচিত্ত ব্রাহ্মসমাজের রমণী, হরিমোহিনী সংকীর্ণচিত্ত হিন্দুসমাজের রমণী। মহিম সাংসারিক চরিত্র, অবিনাশ-ও ভবিষ্যতে তাই হবে। হারাণ বা পানুবাবু গোরার ব্রাহ্মসামাজিক প্রবল প্রতিপক্ষ, প্রেমেও প্রতিদ্বন্দ্বী। তাকে কেন্দ্রকরে কিঞ্চিৎ হাসরসেরও পরিবেশন আছে। ভণ্ডামির প্রতিমূর্তি, শেষে তার পরাভব। পরেশবাবু উল্লেখযোগ্য চরিত্র, আনন্দময়ীর মতই আদর্শবাদের প্রতিভূ। তিনি ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী এবং উদার মানবতাবাদী। গোরা তার মধ্যে দেখেছিল মুক্তির মন্ত্র, পরেশবাবু প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বা ব্রাহ্ম কোনো সমাজেই স্থান পান নি।

## ৬.৬ উপসংহার ঃ গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ

Henry fames তাঁর "The Art of Fiction এ বলেছিলেন — "A novel is in its broadest definition, a personal, a direct impression of life"—উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে, বড়ো করে দেখলে, জীবনসম্বন্ধীয় এক ব্যক্তিগত, প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। খুবই সত্যি কথা, গোরা উপন্যাসের পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রীয় জীবনদর্শন বা আদর্শবাদের প্রতিবিম্বন দেখেছি। গোরা epic ধর্মী মহাকাব্যিক আবেদনযুক্ত উপন্যাস। এই বিশালত্ব এসেছে ভাবের মহত্ব ও গভীরত্ব থেকে। ধর্ম নয়, মানবধর্মেই মানুষের যথার্থ পরিচয়, ঔপন্যাসিক এ কথা বলতে চেয়েছেন। লিও টলস্টয়ের "War and Peace" উপন্যাসেও জীবনসম্পর্কিত এমন মহাকাব্যিক ধারণা আছে। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে—কিন্তু তিনি ব্রাহ্মও নন, হিন্দুও নন, এক প্রগাঢ় মানবতাবাদী।

## ৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী : Bibliography

রবীন্দ্ররচনাবলী : পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত
রবীন্দ্রজীবনকথা : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
E.M. Forster : Aspects of the Novel Essentials of the Theory of Fiction : ed. by Hoffman and Murphy.

## ৬.৮ নির্বাচিত প্রশ্ন

১। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসধারা ও গোরা—এই মর্মে একটি নিবন্ধ লেখ।

২। উপন্যাসের শিল্পতত্ত্বের নিরিখে গোরা উপন্যাসের মূল্যায়ন কর।

৩। গোরা উপন্যাসে বিখ্যাত যুগলবন্ধু চরিত্র—গোরা ও বিনয় চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

৪। গোরা চরিত্র বিশ্লেষণ কর ও তার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মানবধর্মের পরিচয় দিয়েছেন তার বিবরণ দাও।

৫। গোরা উপন্যাসের যুগলনায়িকা—সুচরিতা ও ললিতা চরিত্রের রূপরেখা অঙ্কিত কর।

৬। গোরা উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রসমূহের পরিচয় দাও—আনন্দময়ী; কৃষ্ণদয়াল; পানুবাবু ইত্যাদি।

৭। গোরা উপন্যাসে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ—এই মর্মে একটি নিবন্ধরচনা কর।